

আহলুস সুন্নাহর তাকদির বিশ্বাস

শাইখ সালিহ বিন আব্দুল আযিয (হাফিয়াহুল্লাহ)

আহলুস সুন্নাহর তাকদির বিশ্বাস [১ম পর্ব]

[রহিম রহমান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। অত্র নিবন্ধটি মূলত সৌদি আরবের সব্যসাচী বিদ্বান আল্লামা সালিহ বিন আব্দুল আযিয আলুশ শাইখ (হাফিয়াহুল্লাহ)‘র একটি আরবি লেকচার। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাইখের আলোচনা খুবই সারগর্ভ ও ফায়দাবহ হওয়ায় আমরা তা বঙ্গীকরণ করে বাঙালি মুসলিম পাঠকবর্গের করকমলে পেশ করছি। উল্লেখ্য যে, নিবন্ধের পরিচ্ছেদগুলো আমাদের নিজেদের সংযোজিত, যা তৃতীয় বন্ধনীযোগে লেখা হয়েছে। – অনুবাদক]

[পরিচ্ছেদ: তাকদির বিশ্বাস ইমানের ছয়টি মূলনীতির অন্যতম]

সংক্ষিপ্ত হামদ-সানা ও দরুদ পাঠের পর:

একবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রিয় নবি মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে এসেছিলেন—এক ব্যক্তির সুরতে। আর নবি ﷺ সাহাবিদের মাঝে বসে ছিলেন। তাঁকে হযরত জিবরিল কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। পরকালে বিশ্বাসী উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল মুমিনকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

হযরত জিবরিল ইসলামের পরিচয় জানতে চাইলেন, আর প্রিয় নবি ﷺ উত্তর করলেন। জিবরিল বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। আবার প্রশ্ন করলেন। এবারের প্রশ্ন ইমান সম্পর্কে। ‘আপনি আমাকে ইমান সম্পর্কে কিছু বলুন।’ তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, ‘আপনার বিশ্বাস স্থির থাকবে—আল্লাহ ও ফেরেশতার প্রতি; কিতাব ও রসুলের প্রতি; পরকাল ও ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি।’

এ ছয়টি বিশ্বাসই ইমানের মূল। এসবের প্রতি বিশ্বাসে রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, রয়েছে মহান রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। তাকদির তথা ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস করা ওই ছয়টির অন্যতম।

[পরিচ্ছেদ: তাকদিরের প্রয়োজনীয়তা ও মানবজীবনে এর প্রভাব]

তাকদির মূলত আল্লাহ সৃষ্ট মহাজগতের গোপন রহস্য। যেহেতু আদেশ-নিষেধ করার মালিক তিনি এবং সবকিছুর সৃষ্টকারী তিনি; সেহেতু তাঁর সৃষ্টিতে এমন কিছু থাকতেই পারে, যার রহস্য সৃষ্টিজগতের অজানা। আল্লাহ কেন এতকিছু সৃষ্টি করেছেন, তা যদি সৃষ্টিকুল জেনেই যেতো, তাহলে তারা রুবুবিয়াতে তাঁর সমকক্ষ হয়ে যেতো। তাই তাকদির আল্লাহর সৃষ্টির গোপন রহস্য, যে রহস্যের ভেদ কেউ বের করতে পারবে না।

তাকদির সম্পর্কে ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, ‘তাকদির আল্লাহর সৃষ্টির গোপন রহস্য।’ মুসলিম হিসেবে আমাদের ইমান হবে—আল্লাহ যা ইচ্ছা নির্ধারণ করেছেন, আর যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে

وَالْمُؤْمِنُونَ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ سَبَّحُوا بُحْرًا ۖ وَكُنُوزًا ۖ وَمِنْ لَدُنْهِ رَحْمَتُ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ سَبَّحُوا بُحْرًا ۖ وَكُنُوزًا ۖ وَمِنْ لَدُنْهِ رَحْمَتُ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ سَبَّحُوا بُحْرًا ۖ وَكُنُوزًا ۖ وَمِنْ لَدُنْهِ رَحْمَتُ رَبِّهِ ۚ

বিশ্বাস রাখেন, আর মুমিনরাও বিশ্বাস রাখেন। সকলেই বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, কিতাবসমূহ ও রসুলগণের প্রতি।” [সূরা বাকারা: ২৮৫]

অতএব ভাগ্যের বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। কেননা মহান আল্লাহই সবকিছু পরিচালনা করেন, সমস্ত কিছুর ক্ষমতা তাঁর হাতে, পুরো সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা তিনি, আর তাতে তিনি যা চান তাই হয়, তিনি না চাইলে কিছুই হয় না। এ ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ প্রতি ইমানের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই ইমান বিল কদরের প্রকৃতত্ব। একারণে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে তাকদিরের বিশ্বাসকে ইমানের মাঝে शामिल করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, হাদিস কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। যে কুরআনের বর্ণনানুযায়ী ইমান রাখতে হবে, আল্লাহ সব কিছু সুনির্ধারিতভাবে এবং পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছেন।

[পরিচ্ছেদ: তাকদিরের প্রতি ইমান আনয়নের পদ্ধতি]

তাকদির বা নিয়তির ওপর বিশ্বাস বলতে আমরা আসলে কী বুঝাই? আমরা—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত—যখন বলি, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, এ কথার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কী?

[চলতি পরিচ্ছেদের ১ম ধাপ: আল্লাহ অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ই জানেন]

এর দ্বারা আমরা বোঝাই, আল্লাহ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। সৃষ্টি করার এবং (যে কোনো কিছু) সংঘটিত হওয়ার আগে থেকেই তিনি সবকিছু জানেন। তাঁর জ্ঞান চিরন্তন। অর্থাৎ আদি। তিনি পূর্বাপরের সবকিছুই জানেন। যা হয়নি তা জানেন। তা যদি হতোই তাহলে কীভাবে হতো সেটাও জানেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ “বস্তুত আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে।” [সূরা আনফাল: ২৩] সুতরাং যা হয়নি তাও তিনি জানেন। আর যদি হতো, যদি তিনি তাদের শুনিয়ে দিতেন, তাহলে কেমন হতো তখনকার অবস্থা? তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত।

অতএব ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের মানে হচ্ছে, আপনি বিশ্বাস করবেন, আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্ব থেকে আল্লাহ সবকিছু জানেন, আপনার সামনে যা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান আদি ও চিরন্তন, যার কোনো শুরু বা আরম্ভ নেই। কেননা আল্লাহর সত্ত্বাগত গুণ হচ্ছে তিনি সবকিছু জানেন। এ কারণে তিনি নিজের প্রশংসা করে বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا “আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত।” তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا “নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।” [সূরা নিসা-৩২]

এখানে ‘সবকিছু (بِكُلِّ شَيْءٍ)’ কথাটির মানে, সব তথ্যের জ্ঞান তাঁর আছে। বর্তমানে যে তথ্যাবলি রয়েছে ও ভবিষ্যতে যা হবে, তার সবই তিনি জানেন এবং তা কীভাবে হবে তাও জানেন। এগুলো তার জ্ঞানের পূর্ণতা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য।

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্পর্কে অবগত, যে ব্যাপারে তিনি স্বীয় গুণ বর্ণনা করে বলেন, “আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।” “সবকিছু” কথাটি আম তথা ব্যাপক। তাই কোনো জ্ঞান এ পরিব্যাপ্তির বাইরে নয়। আল্লাহ মূখ্য এবং গৌণ উভয়ই জানেন। তাঁর কাছে কোনো কিছু গোপনীয় নয়। তিনি বলেন, وَمَا تَكُونُ فِي شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَانٍ وَمَا تَنْتَلُوا مِنْهُ مِنْ

অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা করো, আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ করো।” [সূরা ইউনুস: ৬১]

সবকিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত, এ জ্ঞান সৃষ্টি-পূর্ব থেকেই তাঁর আছে।

আল্লাহ তায়ালা আসমান-জমিন এবং তামাম বিশ্বজগত সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন তার পূর্বজ্ঞান অনুসারে কলমকে লিখতে আদেশ দিলেন। তাই কলম আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বেই তামাম সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লিখে ফেলল। ভাগ্য লেখার পর আল্লাহ তায়ালা তা বাস্তবায়ন করতে চাইলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর ইচ্ছামতো সবকিছু বাস্তবায়ন করলেন। এরই সর্বপ্রথম বাস্তবতা হচ্ছে আসমান-জমিন সৃষ্টি, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং জানি। তাছাড়া আল্লাহর কাজের কোনো সীমানা ও সূচনা নেই।

সৃষ্টিকুল যা করে আল্লাহ তা জানেন। আর তিনি তা কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন, **فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ وَإِنَّهُ** “নিশ্চয় এ কুরআন আমার কাছে সমুন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।” [সুরা যুখরুফ: ৪] এর মানে তা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি আরও বলেন, **يَمْخُوْا اللَّهَ مَا يَشَاءُ** “আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।” [সুরা রাদ: ৩৯] এরও অর্থ, তাঁর নিকটেই রয়েছে লাওহে মাহফুজে।

তিনি আরও বলেন, **فِي كِتَابٍ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ أَلَمُ تَعْلَمُ** “তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন, যা কিছু আকাশে ও জমিনে আছে, এগুলোর সবই কিতাবে লিখিত রয়েছে?” [সূরা হাজ: ৭০] এর মানে আগামীতে আসমান-জমিনে যা কিছু হবে তা আল্লাহ জানেন। এ দুয়ের মধ্যে যা রয়েছে তাও কিতাবে লিখিত রয়েছে। বলা হয়েছে, **فِي كِتَابٍ** “নিশ্চয় তা কিতাবে রয়েছে।” এই লেখা এবং জানা আল্লাহর পক্ষে অতীব সহজ। তিনি বলেছেন, **إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** “নিশ্চয় তা কিতাবে রয়েছে, আর এটা আল্লাহর নিকটে অতি সহজ।” [সূরা হাজ: ৭০]

মূলত কিতাব লেখা হয়ে গেছে, পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের সব কর্মাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা তাঁর পূর্ব থেকে জানা ছিল। তাঁর লেখাও সৃষ্টির পূর্বেকার। এটা তাকদিরে বিশ্বাসের প্রথম স্তর।

[২য় ধাপ: আল্লাহ পুরো সৃষ্টিজগতের ভাগ্য লিখে রেখেছেন]

আপনি যখন স্থিরভাবে জানবেন, আল্লাহ মৌল ও গৌনসহ নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে উপস্থিত সামগ্রিক বিষয়ে পরিজ্ঞাত, তখন আপনার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। নবি ﷺ আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বয়ান করেছেন—যার পরে ভাগ্য লেখা হয়। অতঃপর আসমান জমিন সৃষ্টি করা হয়। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস কর্তক বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, **ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين** “আল্লাহ

আল্লাহ বলেছেন, **إِلَّا أَنْ** - অতীত, **إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا** - আমি আগামী কাল করব, **‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’** বলে বলতে পারেন। আর কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব, **‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে’** বলে বলতে পারেন। আর যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন।” [সূরা কাহাফ: ২৩-২৪] আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপারে আপনার অন্তরকে প্রশান্ত রাখুন। তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই হবে। আপনি যে কাজই করেন না কেন, আল্লাহ না চাইলে তা ফলপ্রসূ না। এ সত্ত্বেও আপনার উচিত কাজ করে যাওয়া। কেননা ভবিষ্যতে মহান আল্লাহর ইচ্ছা কী, সে ব্যাপারে আপনি পুরোদস্তুর অজ্ঞ। তাই আপনার উচিত কাজ সম্পাদন করা এবং আল্লাহর নিকটে তৌফিক কামনা করা। অনন্তর আল্লাহ চাইলে তা হবেই। কেননা তাঁর কর্তৃত্বকে পরাভূত করার সাধ্য কারও নেই।

[৪র্থ ধাপ: আল্লাহ সবকিছুর মহান স্রষ্টা, বান্দার কর্মাবলিও তাঁর সৃষ্টির বাইরে নয়]

আপনি আরও স্থিরভাবে জানবেন যে, আপনি যত মাখলুক দেখছেন, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি বলেছেন, هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ “আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি?” [সুরা ফাতির: ৩] নেই, কারণ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আল্লাহ আরও বলেন, وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ اللَّهُ خَلْقُ كُلِّ “আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।” [সুরা যুমার: ৬২] ‘আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন’—এর মানে—তিনি ব্যতীত সবকিছুই মাখলুক তথা সৃষ্ট। আপনি যত মাখলুক দেখছেন, সবকিছুর মহান স্রষ্টা তিনিই। তিনি ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। স্বয়ং বান্দা, কিংবা বান্দার কর্মাবলি, উদ্ভাবন ও অনুভূতি প্রভৃতির সবই আল্লাহর সৃষ্টি। কারণ তিনি সমুদয় বিষয় সৃজন করেছেন।

আপনি যখন নিশ্চিত জানবেন, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা; সবকিছু তাঁরই নির্দেশে হয়েছে, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই, অন্য কারও নয়, তখন আপনার অন্তরের বিশ্বাস হবে বিশুদ্ধ-নির্মল। এমতাবস্থায় আপনার হৃদয়পট থেকে গাইরুল্লাহ-প্রীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফলে আপনার প্রীতি ও ভালোবাসা স্থির হবে শ্রেফ আল্লাহর জন্য।

[পরিচ্ছেদ: আহলুস সুন্নাহর তাকদির বিশ্বাসের সারাংশ বা একনজরে তাকদির বিশ্বাসের স্তরবিন্যাস]

তাকদিরের প্রতি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম‘আতের আকিদা-বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সবকিছুর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর সমস্ত ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে এবং তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকারী। এমনকি আপনি যে কাজকর্ম করছেন তারও সৃষ্টিকর্তা তিনি। এভাবে সকল মানুষের সব কাজকর্মের একমাত্র স্রষ্টা তিনি। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ “আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা।” [সুরা যুমার: ৬২]

[অনুবাদকের টীকা: মাআলিশ শাইখ আল্লামা সালিহ আলুশ শাইখ (হাফিয়াহুল্লাহ) সহজবোধ্য করে এতক্ষণ যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তার সারসংক্ষেপও সরল ও সুন্দর ভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। পাঠক মহোদয় যাতে উক্ত আলোচনা সহজে মনে রাখতে পারেন, সেজন্য আমরা এখানে ইমাম সালিহ আল-ফাওয়ান (হাফিয়াহুল্লাহ)‘র একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি উল্লেখ করছি। ইমাম ফাওয়ান বলেছেন, “আমরা তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করি। আর তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস চারটি স্তরকে शामिल করে। যথা:

১ম স্তর: এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, পূর্বে যা হয়েছে এবং আগামীতে যা হবে, আল্লাহ তা জানেন। আসমান ও জমিনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপনীয় নয়। অতীতের ও ভবিষ্যতের যে অদৃশ্য বিষয়াবলি রয়েছে, তারও কোন কিছু তাঁর কাছে গোপনীয় নয়। এগুলোর সবকিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞানে সমান স্তরের।

২য় স্তর: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, মহান আল্লাহ তা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। লাওহে মাহফুজে তিনি সবকিছুর তাকদির লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, ‘আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন: লিখ। কলম বলল, কী লিখব? তিনি বললেন: তাকদির লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই।’ (আবু দাউদ, হা/৪৭০০; তিরমিযি, হা/২১৫৫; সনদ: সহিহ; শব্দ তিরমিযির)

সুতরাং আমরা বিশ্বাস পোষণ করব, যা কিছু চলছে এবং যা কিছু ঘটছে তার সবকিছুই আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহ তা লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ‘জমিনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো আপদ আপত্তি হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।’ (সুরা হাদিদ: ২২)

সবকিছুই লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে। কোনো কিছুই এর বিপরীত হয়নি। সৃষ্টিজগতের ভাগ্য এবং লাওহে মাহফুজে ভাগ্যের লিখন আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। যেমনটি নবি ﷺ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই, যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই আমি জানি, মাটি তাদের থেকে যতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার কাছে আছে অধিক সংরক্ষণকারী কিতাব।’ (সুরা কাফ: ৪)

৩য় স্তর: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, সবকিছুর ব্যাপারেই মহান আল্লাহর ইরাদাহ এবং ব্যাপক ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার মাধ্যমে কোনো কিছুর ইচ্ছা করবেন, তখন অবশ্যই তা সংঘটিত হবে। আর সৃষ্টিজগতে কোনো কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ঘটে না।

৪র্থ স্তর: সর্বশেষ স্তর—এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, সবকিছুই মহান আল্লাহর মাখলুক তথা সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।’ (সুরা যুমার: ৬২) সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়েছে এবং আগামীতে যা হবে, তার সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের অন্তর্ভুক্ত। কেউই সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু উদ্ভাবন করতে পারে না। আর কেউই সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল আল্লাহ ছাড়া।” দ্রষ্টব্য: মুজমালা আকিদাতিস সালাফিস সালাহ; পৃষ্ঠা: ২৯-৩১; দারুল মিরাসিন নাবাউয়ি, আলজিয়াস কর্তৃক প্রকাশিত; সন: ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি. (২য় প্রকাশ)। টীকা সমাপ্ত]

[পরিচ্ছেদ: ক্বাদা (ফায়সালা) ও কদরের (ভাগ্যের) মধ্যকার পার্থক্য]

এখন আমাদের জানতে হবে, فَضْلٌ (ফায়সালা) ও قَدْرٌ (তাকদির) এর মধ্যে পার্থক্য কী?

আমরা বলি, এটা আল্লাহর ফায়সালা। আবার বলি, এটা আল্লাহর নির্ধারণ (তাকদির)। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? এদের পার্থক্য আমাদের জানতে হবে। পার্থক্য না জানলে কুরআন হাদিসের অনেক ক্ষেত্রে এ দুটোর মাঝে সংমিশ্রণ তৈরি হতে পারে।

এ ব্যাপারে আলেমগণ অনেক মত পেশ করেছেন। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, তাকদির হচ্ছে (সবকিছুর) অগ্রগামী ও ভিত্তি। আর ফায়সালা ওই তাকদিরেরই বাস্তবায়িত রূপ। অর্থাৎ আল্লাহর তাকদির অগ্রগামী, এবং তার যে বাস্তবায়ন হবে তা-ই ফায়সালা। আল্লাহর ফায়সালা বা বাস্তবায়নের স্বরূপ তাঁর বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, فَلَمَّا فَضَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ “যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটলাম (ফায়সালা করলাম)।” [সুরা সাবা: ১৪] কাজটি সম্পাদন করা (ফায়সালা করা) মানে শেষ হয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে কাজটি সম্পাদনের পূর্বে থাকে তাকদির, আর সম্পাদন হয়ে গেলেই সেটা হয়ে যায় ফায়সালা (ক্বাদা)।

ক্বাদা (قضاء) শব্দটি কুরআনে কয়েকটি অর্থে এসেছে। যেমন, ক্বাদা মানে ওহি। আল্লাহ বলেছেন, وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصَجِّجٌ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ “আমি লুতকে এ বিষয় জানিয়ে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে।” [সূরা হিজর: ৬৬] এখানে ‘ক্বাদায়না ইলাইহি’র মানে আমি তার নিকটে ওহি করি বা তাকে সংবাদ দিই। আবার قضاء শব্দটি إلى প্রসর্গ (preposition) যোগে সক্রমক ক্রিয়া (transitive verb) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থও ওহি করা বা সংবাদ দেওয়া।

যেমন আল্লাহ বলেছেন, **غُلُوا كَثِيرًا لَّنَفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَجَيْنَ وَلَنَعْلَنَّ وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي** ‘আমি কিতাবের মধ্যে বনি ইসরাইলকে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড়ো ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে।’ [সূরা বনি ইসরাইল: ৪] এখানে ‘ক্বাদাইনা ইলা’র মানে ভবিষ্যতে যা হবে সে সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। এ অর্থও পূর্বোক্ত ‘ক্বাদা’র সমার্থবোধক। কেননা ফায়সালাকৃত বিষয়ের সংবাদপ্রদান মূলত ঘটিতব্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়ার নামান্তর।

আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আমি কিতাবের মধ্যে বনি ইসরাইলকে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকো দুবার ফাসাদ সৃষ্টি করবে।’ অর্থাৎ ফাসাদ সৃষ্টি হবে। কিন্তু ঘটিতব্য ফায়সালা। সেজন্য মহান আল্লাহ এ সংবাদ দিয়েছেন। ফলে শুধু ‘জানানো (إِخْبَار)’ শব্দ ব্যবহারের চেয়ে ‘ক্বাদা’ শব্দ ব্যবহার করে সংবাদ দেওয়া অধিক অর্থবহ হয়; যেভাবে উক্ত আয়াতটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এটা এমন সংবাদ, যা অচিরেই সংঘটিত হবে। আর আল্লাহ বলেছেন, لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ “তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই।” [সূরা রাদ: ৪১] এটি একটি প্রকার। কিন্তু এটা ওই ক্বাদা শব্দের অর্থজ্ঞাপক নয়, যেটা তাকদির শব্দের সাথে জড়িত থাকে।

উক্ত আলোচনাতে ক্বাদা ও তাকদিরের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। তাকদির হলো পূর্বরূপ, আর ক্বাদা সেই তাকদিরেই বাস্তবায়ন। এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আপনি জানেন না, আল্লাহ আপনার জন্য কী নির্ধারণ করেছেন এবং আগামীকাল আপনি কী করবেন? তবুও আগামীকাল আপনি আপনার কাজে যাবেন, অথবা কলেজে যাবেন, কিংবা বিদ্যালয়ে যাবেন। আপনার এই যাওয়ার কাজটি ক্বাদা তথা বাস্তবায়ন। উক্ত কাজের মাধ্যমে তা (ভাগ্য) আপনার ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে। আর কাজটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে সেটা আল্লাহর তাকদির বা নিয়তি। বাস্তবায়িত হওয়ার পর সেটার নাম ক্বাদা। তবে কখনো কখনো ক্বাদাকেও তাকদির বলা হয়।

এ কারণে ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন উমওয়াস নামক প্লেগরোগে আক্রান্ত এলাকায় যেয়ে ফিরে আসতে চাইলেন, তখন আবু ওবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি আল্লাহর তাকদির থেকে পালাচ্ছেন? এর মানে, যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়ে গেছে—আপনি এই প্লেগ রোগের কারণে অসুস্থ হবেন অথবা মারা যাবেন, তাহলে সেটা থেকে পালাচ্ছেন কেন? কুশলী মুহাদিস ও দক্ষ ফকিহ ওমর তখন জবাবে দিলেন, আবু ওবাইদা, আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে আরেক তাকদিরের দিকেই তো পালাছি। অর্থাৎ তাকদির থেকে আমাদের পলায়নও তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। সবই আল্লাহর তাকদিরের নির্ধারণ।

[পরিচ্ছেদ: নিয়তির ওপর বিশ্বাস করে কিংবা আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা আহলুস সুন্নাহর কাজ নয়]

তাই মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষতিকর বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচাবে। এখান থেকে উপলব্ধ হয়, তাকদিরের প্রতি আহলুস সুন্নাহ ওয়াহ জামাআতের আকিদার অর্থ—মুসলিমকে কার্যকারণ বা উপায়-উপকরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এখন আমরা এ কথা বলব না যে, ‘উপায় অবলম্বনের কোনো প্রভাব নেই, আল্লাহ যদি আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেন; যা আমাকে পোড়াবে, তাহলে আমি পুড়ব, আর নির্ধারণ না করলে পুড়ব না।’

আমরা এসব বলব না। এসব কথা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা মহান আল্লাহ জাহান্নামের জন্য (নির্দিষ্ট) রীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা পোড়াবে। এটা তাঁর অন্যতম সৃষ্টি জাহান্নামের জন্য তাঁর নির্ধারণ করা তাকদির। তিনি বলেছেন, وَمَنْعًا لِّلْمُفْسِدِينَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا “আমি একে (আগুনকে) করেছি স্মারক (যা জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়) এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী।” [সূরা ওয়াকিয়া: ৭৩]

আপনি জাহান্নামে প্রবেশ করবেন আর বলবেন, আমি জাহান্নামে প্রবেশ করব, আগুনে ভস্মীভূত হওয়া যদি আমার ভাগ্যে থাকে, তাহলে আমি ভস্মীভূত হব। কিন্তু আপনি তো ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) নন; যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন, اِبْرَاهِيمَ فَلَنَّا يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ “আমি বললাম, হে অগ্নি, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।” [সূরা আশ্বিয়া: ৬৯]

তাই আপনি যদি এমন কাজের নিকটবর্তী হোন, যার ক্ষতিকর দিক আপনার জানা আছে, তাহলে অবশ্যই সেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর (সেখান থেকে বাঁচার উপায় অবলম্বন করতে হবে)। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। অতএব আহলুস সুন্নাহর নিকটে উপায়ের ওপর বিশ্বাস করা ইমান বিল কদরের তথা অদৃষ্ট-বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন (স্তম্ভ)।

উপায় অবলম্বনের অস্তিত্ব আছে। কেননা কাজের পরিণতি কার্যকারণ তথা উপায়-উপকরণের সাথেই সংযুক্ত থাকে। আমরা ব্যাপারটা অনুভব করতে পারি এবং প্রত্যক্ষও করি। যেমন আপনি লিখলেন, তাতে পাতা ভরে গেল। আপনি না লিখলে তা খালি থাকত। তদনুরূপ আপনি মসজিদে গেলেন, তাতে আপনার পুণ্য অর্জন হলো। পক্ষান্তরে আপনি জামাআত ত্যাগ করে বাসায় বসে থাকলেন, তাতে আপনার কোনো কিছু (সওয়াব) অর্জন হলো না। এটাই আল্লাহর তাকদির।

এজন্য অবশ্যই উপায় অবলম্বন করতে হবে। যেমনটি করেছেন মুমিনদের সর্বোত্তম নেতা এবং বনু আদমের সর্দার। তিনি মদিনায় হিজরতের সময় কী করেছিলেন? তিনি কি ভরসাকারীদের সর্দার নন? অবশ্যই। তাকদিরের ব্যাপারে তিনি কি সর্বোত্তম মুমিন নন? অবশ্যই। তিনি তো তাঁর শয্যা ত্যাগ করেছিলেন। সেখানে রেখেছিলেন আলি বিন আবু তালিবকে। তাঁর এ কাজের যদি কোনো প্রভাবই না থাকে এবং সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে অগ্রিম নির্ধারিত থাকে, তাহলে তিনি এমনটা করলেন কেন? তিনি কাজ করেছেন, সেটা একটা কার্যকারণ বা উপায় ছিল। তিনি উপায় অবলম্বন করতে আদিষ্ট হয়েছেন।

যেমন আল্লাহ বলেছেন, اَتَّعَ سَبِيْلًا “অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন।” [সূরা কাহফ: ৮৯] আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজের বিছানায় রাখাটাই ছিল তাঁর সর্বপ্রথম উপায় অবলম্বন। শত্রুপক্ষ দরজার ছিদ্র দিয়ে দেখল, সে এখনও ঘুমিয়ে আছে। নবি ﷺ বলেছেন, “যুদ্ধ হচ্ছে ছলচাতুরি।” [সহিহ বুখারি, হা/৩০৩০; সহিহ মুসলিম, হা/১৭৩৯]

এরপর তিনি শত্রুপক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের চোখে ধুলোবালি ছিটিয়ে দিলেন। কাজটি না করলেও আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এটি একটি উপায় ছিল। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, উপায় অবলম্বন করা তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনার উপায় অবলম্বন করা আল্লাহর ওপর ভরসা করার অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি এমন না যে, আপনি ভরসা করলেন, অথচ উপায় অবলম্বন না করে বসে থাকলেন। এর নাম বিশ্বাস না, এর নাম বিশুদ্ধ তাওয়াক্কুল (ভরসা) না।

একবার হজের মৌসুমে ইয়েমেন থেকে এক প্রতিনিধিদল নবি ﷺ এর নিকটে আসল। তাদের সাথে না ছিল খাবার, আর না ছিল জীবনধারণের উপকরণ। তারা পাহাড়পর্বত অতিক্রম করছে, অথচ তারা ছিল রিজহস্ত। এ দেখে নবি ﷺ বললেন, ‘তোমরা সঙ্গে কিছু নিয়ে আসনি কেন?’ তারা বলল, ‘আমরা তাওয়াক্কুলকারী।’ নবি ﷺ বললেন, ‘না, বরং তোমরা পরমুখাপেক্ষী।’

প্রকৃতপক্ষে এটা এক ধরনের পরনির্ভরশীলতা। আপনি পাথের সঙ্গে নিন, উপায় অবলম্বন করুন, বাকি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আপনি বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবেন। আপনি উক্ত কার্যকারণের মাধ্যমে উপকৃত হোন—তা যদি তিনি না চান, তাহলে আপনি উপকৃত হবেন না। কিন্তু আপনি উপায় অবলম্বন করতে আদিষ্ট হয়েছেন।

দেখুন, নবি ﷺ ও তাঁর সাথী আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একসাথে হিজরত করলেন। তাঁরা একজন দক্ষ গাইড ভাড়া করলেন, যে তাঁদেরকে পথ দেখাবে। এটাই হচ্ছে উপায়। এটা অবলম্বন করতেই হবে। সেখানে তাঁদের পদচিহ্ন আর ট্রাক খুব স্পষ্ট ছিল। তাতে মুশরিকরা তাদের জায়গা চিনতে পারত। কিন্তু তাঁরা একজন রাখাল নিযুক্ত করেছিলেন। সে তার ছাগলে সওয়ারি হয়ে তাঁদের পদচিহ্নগুলো মুছে দিয়েছিল। তাঁরা মক্কা-মদিনার মাঝে একটা পাহাড়ে গিয়েছিলেন। উঁচুতে একটা গুহা ছিল। তাতেই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তাঁরা সকল উপায়ই অবলম্বন করেছিলেন, যাতে মুশরিকরা তাঁদের নিকট পৌঁছতে না পারে। এই উপায় অবলম্বনের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। আর এটাই আল্লাহর তাকদির। সুতরাং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা আল্লাহর তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। তাইতো সর্বশ্রেষ্ঠ তাকদির-বিশ্বাসী তাওয়াক্কুলকারীদের নেতা নবি ﷺ উপায় অবলম্বন করেছেন।

এরপর কী ঘটল? তাঁদের অবলম্বিত কার্যকারণের সবগুলো ফলপ্রসূ হয়েছিল না। মুশরিকরা কাছে চলে এসেছিল এবং গুহার ওপরে অবস্থান নিয়েছিল। গুহা ছিল ঠিক তাদের নিচেই। আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুশরিকদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবি ﷺ কে বললেন, ‘আল্লাহর রসুল, তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকেও তাকায়, তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।’ এতসব উপায়বলম্বন নবি ﷺ এর কোনো কাজে আসেনি।

মুশরিকরা গুহার ওপরে অবস্থান করছিল। তখন নবি ﷺ আবু বকরকে জবাব দিলেন, ‘আবু বকর, ওই দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় হিসেবে আছেন স্বয়ং আল্লাহ?’ আল্লাহ তায়াল্লা তাঁদের ইমানদীপ্ত বাক্যালাপ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, لَصَحْبَةٍ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَقُولُونَ “স্মরণ করো, যখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।” [সূরা তাওবা: ৪০]

এ থেকে বোঝা যায়, তিনি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। সে ব্যাপারে তিনি আদিষ্ট ছিলেন, আর বাকিটুকু তো আল্লাহর ওপর। অতএব আমরা বুঝতে পারলাম, (হাত গুটিয়ে বসে না থেকে) অবশ্যই উপায় অবলম্বন করতে হবে। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসী বিশ্বাস করবে—আল্লাহই সবকিছুর নির্ধারক, তিনি সবকিছু লিখে রেখেছেন, তাই তাকে উপায় অবলম্বন করতে হবে, যাতে তার উদ্দিষ্ট বিষয় হাসিল হয়। আলোচনার শেষে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং মুমিনরা পূর্ণ উদ্যমতার সাথে কাজ করবে। কাজকর্মে সে স্বাধীন। এটা তাকদিরের ওপর বিশ্বাসের ফল।

[পরিচ্ছেদ: আল্লাহর তৌফিক ব্যতিরেকে কেউ সুপথ পেতে পারে না]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট তাকদির হচ্ছে, আপনার বিশ্বাস থাকবে—আপনি একজন দুর্বল লোক এবং আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাঁর তৌফিক ব্যতিরেকে আপনি সঠিক পথ পাবেন না। তিনি আপনাকে ত্যাগ করলে আপনি সুপথ পাবেন না। কেননা শয়তানের সংখ্যা এবং আল্লাহর পথ থেকে বিমুখকারী বস্তুর সংখ্যা অনেক। তিনি যদি আপনাকে ছেড়ে দেন, তাহলে ভ্রষ্টদের সাথে আপনাকেও ভ্রষ্ট করে দিবেন।

কিন্তু আপনার ওপর তাঁর খাস অনুগ্রহ আছে (তাই আপনি হেদায়েত পেয়েছেন)। সেজন্য আপনার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। যিনি আপনাকে মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এই আলোচনা সভায় সমুপস্থিত করেছেন। আর এ ধরনের আলোচনা সভায় আগত লোকদের ফেরেশতারা রহমত দিয়ে ঢেকে রাখেন, প্রশান্তি দিয়ে আবৃত করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। এসব আল্লাহই অনুগ্রহ।

অতএব আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহই মানবচিহ্নে ইমানকে প্রীত করে তোলেন এবং তাকে হেদায়েত দান করেন। মুমিন বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ রহমত আছে; সে রহমতেই তারা হেদায়াত ও ইস্তিকামাত (দীনের ওপর অবিচলতা) লাভ করে। তাই এই নিয়ামতের জন্য তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং আরও বেশি অনুগ্রহ, ইহসান ও দীনের প্রতি অবিচলতার কামনা করে দোয়া করবে। নবি ﷺ ভাগ্যের প্রতি সর্বোত্তম ইমানদার হয়েও দোআ করতেন, يَا مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرَفْ قُلُوبَنَا يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ “অন্তরসমূহের পরিবর্তক মাবুদ, আপনি আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। অন্তর পরিবর্তনকারী মাবুদ, আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যে অবিচল রাখুন।” [সংমিলিত দলিল: তিরমিযি, হা/২১৪০; সনদ: সহিহ; মুসলিম, হা/২৬৫৪; তাকদির অধ্যায় (৪৭); পরিচ্ছেদ- ৩]

নবি ﷺ জানতেন, সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে, অন্তরসমূহ দয়াময় আল্লাহর আঙুলসমূহের দুই আঙুলের মধ্যে রয়েছে। তাই আপনি যদি আপনার কাজ যথাযথ আদায় করেন, তাহলে আল্লাহর হেদায়েতের উপযুক্ত হবেন। কেননা তার রহমত সর্বত্র ব্যাপ্ত। এটাকে (অনুগ্রহ প্রদানকে) তৌফিক বলা হয়। আপনার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি আপনাকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে शामिल করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে (আপনার

প্রতি) ভালোবাসা ও তৌফিক। আল্লাহ বলেছেন, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ “কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ইমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ঘৃণা।” [সূরা হুজুরাত: ৭]

আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ইমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহই তৌফিকদাতা। এ কারণে শূয়াইব (আলাইহিস সালাম) স্বীয় প্রভুর গুণকীর্তন করে বলেছেন, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۖ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ ۖ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ أُورِثُ شَوْدَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ “আমি যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। তবে আল্লাহর তৌফিক দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে। তাই আমি তাঁর ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।” [সূরা হুদ: ৮৮] তৌফিক আল্লাহর হাতে। সুতরাং প্রতিটি কাজে তাঁরই তৌফিক কামনা করুন।

[পরিচ্ছেদ: ‘তৌফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে’—এ কথার ব্যাখ্যা]

‘তৌফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে’—এর মানে কী? এর মানে তৌফিক দিয়ে আল্লাহ আপনার চলার পথ সুগম করে দিবেন। মাথলুক নিজে নিজে একটি কাজ করতে পারে না। তার কাজ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হতে হয়।

ধরুন, আপনি আপনার গাড়িখানা খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করলেন। তাতে সব ধরনের উপকরণ ব্যবহার করলেন। সাধ্যমত সবই করলেন। এরপর আপনি রাস্তায় বের হয়ে বললেন, ‘আমি একজন দক্ষ ড্রাইভার, আর (আজ) খুব দ্রুত ড্রাইভ করব না, বরং সাবধানে ড্রাইভ করব।’ এগুলো আপনার সাধের মধ্যে। এরচেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য আপনার নেই।

কিন্তু রাস্তায় একটি বড়ো পাথর রাখতে পারে, যা আপনার গাড়ি উল্টিয়ে দিবে। এ ক্ষমতা কার হাতে? অবশ্যই আল্লাহর হাতে। এজন্য সব কাজ করেও আল্লাহর কাছে তৌফিক ও সঠিকতা চাইবেন, যাতে আল্লাহর সাহায্য পান। কেননা এমন কিছু বিষয় আছে, যা আপনার তাকদির হিসেবে নির্ধারিত। আপনি তা-ই করবেন, যা আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার এমন কিছু বিষয়ও আছে যা আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। অথচ তা আপনার কৃতকর্মের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। (সেখান থেকে আপনি আল্লাহর রহমতে বেঁচে যাবেন)

যেমন, হতে পারে গাড়ি চালানোর সময় একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি (*) আপনার সামনাসামনি চলে আসল। আপনার সামনে অন্য কোনো পথ নেই। হয় তার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করবেন, নয় তো গাড়িসহ উল্টে যাবেন, অন্য কোনো পথ নাই। কিন্তু সবকিছু আল্লাহর হাতে, তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তিটিকে সজাগ করতে সক্ষম।

[(*) অনুবাদকের টীকা: ঘুমন্ত অবস্থায় চলাফেরা করাকে স্লিপওয়াকিং ডিজঅর্ডার বলা হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাকে সোমনামবুলিজম বলা হয়। স্লিপওয়াকিংয়ে ভোগা ব্যক্তি অবচেতন মনে চলাফেরা থেকে শুরু করে গাড়িচালনা ও মানবহত্যা পর্যন্ত করতে পারে। টীকা সমাপ্ত।]

এমনও এতে পারে, ব্যক্তিটির সাথে আপনার মুখোমুখি হতেই আল্লাহ তাকে সজাগ করে দিলেন। আর সজাগ ব্যক্তিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। তৌফিক দেওয়ার মালিক যে আল্লাহ। প্রত্যেক ভালো কাজে তিনি আপনাকে সঠিকতা দিবেন। আপনার ওপর তার অনুগ্রহ আছে। সে কারণে আপনি তাঁর শুকরিয়া আদায় করবেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি কাজ করা ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি আপনার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবেন না। কেননা (মানুষের) প্রতিকূল বিষয় অনেক।

সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান। তাতে বিশ্বাস থাকবে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আপনাকে সঠিকতা এবং সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অবিচলতা দান করেছেন। এখন ধরুন, যদি একজন আপনার কাছে প্রলুব্ধকারী জিনিস নিয়ে হাজির হয়, ‘এই, আমার কাছে এসো।’ সে আপনাকে নেশাদার দ্রব্য দিল, যেগুলো আপনাকে বিপথে নিয়ে যাবে। তখন আপনাকে সেখান থেকে রক্ষা করবে কে? অবশ্যই রক্ষা করবেন আল্লাহ।

আবার এমনও হতে পারে, এক লোক এসে আপনাকে অসৎপথ দেখাচ্ছে। সে বলল, ‘চল যাই।’ আর আপনি তার সাথে এক-দুই-তিন করে রাত্রি জাগরণ করতেই থাকলেন, রাতে হারাম জিনিস দেখতে লাগলেন। আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে বশীভূত করে ফেলল। কিন্তু সেখান থেকে মহান আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিয়ে রক্ষা করলেন। কারণ আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। এটাকেই আমরা ‘তৌফিক’ বলছি।

পক্ষান্তরে আপনি প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। আল্লাহ আপনাকে লাক্ষিত ও অপমানিত করলেন। এর মানে তিনি আপনাকে ত্যাগ করছেন, ‘তুমি যা ইচ্ছা করো।’ এমন হলে আপনি কি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন? কখনোই না। তিনি পরিত্যাগ করলে আপনি বরং নিজেকে নিয়ে বড়াই করবেন। যেমন তারা নিজেদের নিয়ে বড়াই করেছিল। তাদের কী হয়েছিল? তাদের নৌযান আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছিল। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, **وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ**, “তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা রাদ: ১১]

সুতরাং আপনাকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে আপনি সঠিকতায় পৌঁছতে পারবেন না। তাই আপনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

[পরিচ্ছেদ: আপনি যা পেয়েছেন, তা কখনো না পাওয়ার ছিল না, আর যা পাননি, তা কখনো পাওয়ার ছিল না]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট ইমান বিল কদরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হচ্ছে, আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, আপনি যা পেয়েছেন তা কখনো না পাওয়ার ছিল না, আর যা পাননি তা কখনো পাবার ছিল না।

আপনি আল্লাহর রাজত্বে তাঁর এক নগণ্য প্রজা। তাঁর রাজত্বে আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আপনি পালিত, পরাভূত, অসহায় ও নিঃস্ব। আল্লাহই আপনাকে পরিচালিত করেন। তিনি আপনাকে কাজ করার তৌফিক এনায়েত করেছেন, বিধায় আপনি তা করতে পারেন। পক্ষান্তরে তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করলে, আপনি অন্য কিছু করেন, আপনার কাজের ভার আপনার ওপরই ন্যস্ত করেন (ফলে আপনি ধ্বংসে নিপাতিত হন)। তিনি আপনাকে কল্যাণ দেন, আবার তিনিই আপনার ওপর বাল্য-মুসিবত নাজিল করেন।

আহলুস সুন্নার এই বরকতময় আকিদাতে যার ইচ্ছা সে বিরোধিতা করুক, যার ইচ্ছা সে বাধা দিক, আল্লাহর পথ থেকে ফিরে যাক এবং আল্লাহর কুরআনের আয়াত ও নবির সুন্নাহের বিকৃত বুঝ বুঝুক। যেখানে পানশালা ভিন্ন, সেখানে তো চিন্তাফিকির ভিন্ন হবেই।

যারা তাকদিরের আকিদায় আহলুস সুন্নাহর বিরোধী মত পোষণ করে, তারা দুটি দলের অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে আমি তা উল্লেখ করছি। দল দুটি হলো— (১) কাদারিয়াহ ফিক্কা (২) জাবরিয়াহ ফিক্কা।

(১) কাদারিয়াহদের মধ্যে আবার দুটি দল। এক. চরমপন্থি কাদারিয়াহ, দুই. মধ্যপন্থি কাদারিয়াহ, যারা চরমপন্থি নয়।

এক. চরমপন্থি কাদারিয়াহরা আল্লাহর পূর্বজ্ঞানকে অস্বীকার করে। তারা বলে, ‘কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পরেই কেবল আল্লাহ তা জানতে পারেন।’ সর্বপ্রথম সীসওয়াইহ নামের এক অগ্নিপূজক এই জঘন্য আকিদা মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সে ছিল বুশরাবাসী বিদ‘আতী। এ ধরনের চিন্তাভাবনা সে মা‘বাদ আল-জুহানীর কাছে প্রকাশ করে। আর মা‘বাদও বুশরায় থাকত। এই আকিদা সে-ই জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। সে বলে বেড়াত, কাজই সর্বাত্মে, মহান আল্লাহ কাজ সংঘটিত হওয়ার আগে কিছুই জানেন না। এটাকে মহান আল্লাহর মানহানি করার শীর্ষপর্যায় বলা যায়।

আল্লাহ কি আপনার মতো অপূর্ণ? না। বরং তিনি স্বীয় নাম এবং গুণাবলি সহকারে পরিপূর্ণ (তাতে কোনো অপূর্ণতা নেই)। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। অথচ সেই মা‘বাদ এই ভ্রষ্ট বিদ‘আতী আকিদা মানুষের মাঝে প্রচার করে, আর মানুষরা সেটাই গ্রহণ করে। তাদেরকে বলা হয় চরমপন্থি কাদারিয়াহ। তারা আল্লাহর পূর্বজ্ঞান অস্বীকার করে।

এ কারণে তাদের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমগণ বলে থাকেন, তোমরা আল্লাহর ‘ইলমের ব্যাপারে কাদারিয়াহদের সাথে মুনাযারা করো। যদি তারা ‘আল্লাহর ইলম’ সিফাতটি স্বীকার করে, তাহলে তো তারা পরাভূত হয়ে গেল। আর যদি অস্বীকার করে বলে, আল্লাহ জানেন না, তাহলে তাদেরকে ‘কাফির’ বলতে হবে। তারা যখন বলবে, আল্লাহ সবকিছু জানেন, তখনই তারা হেরে যাবে। মুনাযারা খতম!

দুই. কাদারিয়াহদের দ্বিতীয় দল হচ্ছে মুতাজিলা ফেক্কা। কাদারিয়াহ মানে—যারা তাকদির অস্বীকার করে, কিংবা তাকদিরের কোনো একটি স্তর অস্বীকার করে।

মুতাজিলাদের মতে, আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনিই সবকিছুর লেখেছেন। কিন্তু তারা বলে, আল্লাহ বান্দার কর্ম সৃষ্টি করেননি। এরা মুতাজিলা ফেক্কা।

অথচ বান্দার কর্মাবলি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, غَيْرُ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَلْقٍ “আল্লাহ ব্যতীত কোনো স্রষ্টা আছে কি?” [সূরা ফাতির: ৩] আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। [*] মুতাজিলারা অগ্নিপূজকদের মতো বিভ্রান্তিকর আকিদা পোষণ করে। মূলত এটা অগ্নিপূজকদের আকিদা। কেননা তারা সৃষ্টিকর্তার একাধিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, দুজন স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে। এদিকে মুতাজিলারা আরও বাড়িয়ে বলে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কর্মের স্রষ্টা। তাহলে কতগুলো সৃষ্টিকর্তা হলো! আল্লাহর পানাহ, আল-ইয়াযু-বিলাহ।

[(*) অনুবাদকের টীকা: এছাড়া আরও অনেক দলিল আছে। যেগুলো প্রমাণ করে, বান্দার কর্মাবলি আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের

কর্মকেও।’ (সুরা সাফফাত: ৯৬) নবিজি ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক কর্মকার ও তার কর্মকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সিলসিলাহ সহিহাহ, হা/১৬৩৭; সনদ: সহিহ) টীকা সমাপ্ত।]

তাদেরকে চরমপন্থা-বর্জিত কাদারিয়া বলা হয়। কারণ তারা আল্লাহর পূর্বজ্ঞান স্বীকার করে। কিন্তু তারা ‘আল্লাহ যে বান্দার কর্মেরও স্রষ্টা’—এ কথাটি অস্বীকার করে থাকে। তারা বলে, বান্দাই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা।

(২) আরেকটি ফের্কা হচ্ছে জাবরিয়াহ। তারাও দু ভাগে বিভক্ত। এক. চরমপন্থি জাবরিয়াহ, দুই. মধ্যপন্থি জাবরিয়াহ, যারা চরমপন্থি নয়।

এক. চরমপন্থি জাবরিয়াহরা জাহাম বিন সফওয়ানের অনুসারী। তার পূর্বে তারা জাহাদ বিন দিরহাম বা তাদের সমমনা বিদ‘আতীদের অনুসারী ছিল। তারা বলে, মানুষ তার কর্মে প্রবল বায়ুসঞ্চালনের জায়গায় পাখির পালকের মতো। নিজের কর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বা এজিয়ার তার নেই। [অর্থাৎ সে আল্লাহর হুকুমে মজবুর; পাখির পালক বায়ুতে যেমন বায়ুর বিপরীতে নড়াচড়া করতে পারে না, ঠিক তেমনি মানুষও আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলতে পারে না। – অনুবাদক]

এ কথা যে বলে, আমি তাকে থাপ্পড় দিব। তুমি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে কী দলিল উত্থাপন করবে? এ কাজ করতে যদি আল্লাহই আমাকে পরিচালনা করেন এবং বাধ্য করে থাকেন, তাহলে তুমি কেন আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবে? কারও কাছ থেকে যদি কিছু চুরি যায়, তাহলে সে তা পেতে চায়। বলে, ‘তুমি কেন চুরি করলে?’ আমার প্রয়োজন হয়েছে, তাই করেছি। আমি এক্ষেত্রে নিরুপায়, মজবুর।

আসলে তারা কাজের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু মুনাযারায় তারা এটা অস্বীকার করে বলে, ‘বান্দা বায়ুসঞ্চালনের জায়গায় পাখির পালকের মত।’ নিঃসন্দেহে এটা ফালতু ও ভ্রান্ত কথা। এ কথা মানুষের স্বাভাবিক বিবেকের পরিপন্থি। কেননা প্রত্যেকেই জানে, তার নিজের ইচ্ছা আছে এবং তাতে সে স্বাধীন। সেজন্য আপনি ইচ্ছা করলে একটা বাড়িতে যেতে পারেন, আবার সেখানে না যেয়ে অন্যের বাড়িতেও যেতে পারেন। আসলে তাদের কথা বাতিল। স্বাভাবিক বিবেক কখনোই তা মেনে নেবে না।

[পরিচ্ছেদ: তাকদিরের আকিদায় আশারি-মাতুরিদিদের ভ্রান্তি ও তার ব্যবচ্ছেদ] (*)

দুই. পক্ষান্তরে মধ্যপন্থি জাবরিয়াহরা মূলত ‘আশারি’ নামে পরিচিত। তারা মনে করে, বান্দা তার কাজ নিজে সৃষ্টি করেনি, আল্লাহই তার কাজের স্রষ্টা। কিন্তু তারা কার্যকারণ বা উপায়-উপকরণ এবং তার প্রভাব অস্বীকার করে। তারা বলে, আগুনে পাতা পড়লে আগুন তা পোড়ায় না, বরং তা পোড়ান স্বয়ং আল্লাহ। চাকু রুটি-গোশত কাটে। কিন্তু তারা বলে, চাকু এটা করে না। বরং চাকু যখন চালানো হচ্ছে, তখন আল্লাহই গোশত-রুটি কাটছেন। এভাবে তারা কার্যকারণ বা উপায় অস্বীকার করে থাকে।

[(*) অনুবাদকের টীকা: বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় আশারি-মাতুরিদিদের ওপর স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ করা হলো। যদিও তা পূর্বের পরিচ্ছেদের আওতাভুক্ত। টীকা সমাপ্ত।]

অথচ বান্দা পাপকাজ-সহ অনেক কাজই করে। এক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কী হবে? তারা বলবে, এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান হচ্ছে, তারা শুধু কাজ অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কাজ করে না।

‘তারা কাজ অর্জন করে’—এর মানে কী? তাদের মতে, বান্দা তার কাজের মুখোমুখি হওয়ার সময় আল্লাহ তা সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে বান্দা নিজে তার কাজ সম্পাদন করে না।

তারা মনে করে, কাজকর্মে বান্দা কেবল কর্মস্থল। আল্লাহ বান্দার জন্য যা তাকদিরে রেখেছেন, বান্দা সেটাই করে। এতে বান্দা কেবল তাকদিরের বাস্তবায়নস্থল। আপনি আশারিদের কথা খেয়াল করলে তা দেখতে পাবেন। তারা আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যেতে পারে, এই যে আপনি এখন মসজিদের মধ্যে আছেন। তারা বলবে, এটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলেই আপনি এই স্থানে অবস্থান করছেন। তারা এর নাম দিয়েছে, كَسْب (উপার্জন)। তাদের মতে, প্রকৃতপক্ষে বান্দা নিজের কর্ম সম্পাদন করে না, বরং তারা শুধু كَسْب বা উপার্জন করে।

এই কাস্ব বা উপার্জনের পরিচয় কী? তাদের উলামারা এ মাসআলাহয় মতানৈক্য করে বারোটটিরও অধিক মত পেশ করেছে। তাদের প্রত্যেকেই এর স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের ইমাম আবুল হাসান আল-আশারি এর কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় দেননি। তাদের এ ধরনের বিস্তর মতানৈক্য দেখে বোঝা যায়, তারা নিজেদের আকিদা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নয়।

কবি সত্যই বলেছেন,

مما يقال ولا حقيقة تحته~ معقولة تدنو لذي الأفهام

الكسب عند الأشعري والحال~ عند البيهقي وطرفة النظام

“সমঝাদারের কাছেও অধরা রয়ে যায় যেসব ভাষার সমঝ ও বাস্তবতা,

যথাক্রমে তা আশারির ‘কাস্ব’, বাহশামির ‘হাল’ ও নাযযামের ‘তুফরা’।”

সুতরাং আশারিদের নিকটে كَسْب (উপার্জন) মানে বান্দা শুধু কর্মস্থল, সে নিজে কাজ সম্পাদন করে না। এতে সে মজবুর তথা বাধ্য।

তাই বলতে হয়, তাদের বিচক্ষণ পণ্ডিতরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, তারা জাবারিয়াহ। যদিও তারা জাবারিয়াহ হওয়া থেকে পলায়ন করতে চায়। মূলত তাদের নিজেদের আকিদার পাঠ্যবইগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাদের পণ্ডিতবর্গ উল্লেখ করেছে, তারা জাবারিয়াহ। তারা আবার বলে, আমরা মনে করি বান্দা বাধ্য। কিন্তু এই বাধ্যতা বাতেনি অবস্থায় প্রযোজ্য, জাহেরি অবস্থায় নয়। জাহেরি অবস্থায় বান্দা নিজ কর্মে স্বাধীন। কিন্তু বাতেনি অবস্থায় সে বাধ্য বা মজবুর। কারণ সে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাকদির বাস্তবায়নের ক্ষেত্র মাত্র। বান্দা কখনো কাজ করে না; সে শুধু অর্জন করে।

একটু খেয়াল করুন। এই ‘কাস্ব (অর্জন)’ শব্দটা আহলুস সুন্নার আকিদার কিতাবেও আছে। যেমন, লুম‘আতুল ই‘তিকাদ ও শারহুল আক্বীদাহ আত-তাহাবিয়াহ গ্রন্থে। তারা এর যথাযথ ব্যাখ্যা করে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ, “সে তাই পাবে, যা সে উপার্জন করেছে এবং তাই তার ওপর বর্তাবে, যা সে করেছে।” [সূরা বাকারাহ: ২৮৬]

কিন্তু তারা উক্ত শব্দের মাধ্যমে উল্লিখিত বাতিল পরিভাষা না বুঝিয়ে কুরআন-সুন্নাহয় যা আছে তাই বুঝিয়েছেন। এজন্য আকিদার কিতাবগুলোর বিভিন্ন অস্পষ্ট বিষয়াদি শোধন করা দরকার। সেসব শব্দ ভালোভাবে স্পষ্ট করতে হবে, যেগুলোর মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ অন্যান্য বিদ'আতী ভ্রষ্ট ফের্কার সাথে মিলে যাওয়ার সম্ভবনা রাখে।

আর তাই আমরা 'কাস্ব (উপার্জন)' শব্দটি ব্যবহার করলে তা স্পষ্টভাবে শারঈ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিব; শব্দটি বলে চুপ থাকব না। আমরা স্পষ্ট করে দিব, 'কাস্ব (উপার্জন)' হচ্ছে ওই উপার্জন, যার ফল তার কর্তার ওপর নিপাতিত হয়, হতে পারে সেটা ভালো কিংবা মন্দ। যেমন আয়াতটির প্রথমার্শে বলা হয়েছে, 'সে তাই পাবে, যা সে উপার্জন করেছে।' অর্থাৎ ভালো কিছু পাবে। আর পরের অংশে বলা হয়েছে, 'তাই তার ওপর বর্তাবে, যা সে করেছে।' অর্থাৎ খারাপ কিছু বর্তাবে। 'কাস্ব (উপার্জন)' শব্দটা কুরআনে ঐ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যে কাজের ফল তার কর্তার উপকারেও আসতে পারে, আবার ক্ষতিও হতে পারে।

কিন্তু আশারি-মাতুরিদরা এ কথা বলে না। আশারিরা যে জাবরিয়াহ মতবাদ পোষণ করে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। অপরদিকে মাতুরিদরা মুতাজিলি আকিদা ধারণ করে। কেননা তারা কাদারিয়াহ মতবাদ পোষণ করে। তারা 'কাস্ব (উপার্জন)' শব্দটার ক্ষেত্রে বলে, 'অবশ্যই বান্দার ইরাদাহ বা ইচ্ছা থাকতে হবে। আর ইরাদাই বাস্তবায়িত হয়।' তা এই ইরাদাহ (ইচ্ছা) কি আল্লাহর থেকে উদ্ভূত নাকি বান্দার থেকে?

মাতুরিদরা বলে, এটা বান্দার থেকে উদ্ভূত। এ কথা বলে তারা মুতাজিলাদের আকিদা পোষণ করেছে। আর আশারিরা বলে, এটা আসে স্বয়ং রবের পক্ষ থেকে। এ কথা বলে এরা আবার জাবরিয়াহদের মত পোষণ করেছে। অর্থাৎ তাদের মতানুযায়ী ইচ্ছা, শক্তি, কর্ম এবং যা অর্জিত হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়; সেখানে বান্দা স্রেফ কর্মক্ষেত্র মাত্র।

এসব ভ্রান্ত আকিদা ভালোভাবে নিরিখ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, আহলুস সুন্নাহই মধ্যপন্থি। তারা বান্দার কর্মের স্বাধীনতা আছে বলে মনে করে। তারা বলে, বান্দা তার নিজের কাজ সত্যসত্যই করে থাকে। কাজ করার পর অনুভব করে, সে কাজটি করেছে। কিন্তু কাজটি তৈরি করেছেন মহান আল্লাহ। ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্রেফ কুদরত (শক্তি-সামর্থ্য) দিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। আপনার কুদরত আছে, কিন্তু ইচ্ছা না থাকলে কাজটি সংঘটিত হবে না।

আপনি মসজিদে যাবেন, অথচ আপনার যাওয়ার ইচ্ছা নেই, তাহলে আপনার মসজিদে যাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে, আপনার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার শক্তি আপনার নেই। আপনি বলছেন, আমি মসজিদে যাব, কিন্তু আমার শক্তি-সামর্থ্য নাই, আমি নড়তে পাড়ছি না, আমি অবশ্য হয়ে বাড়িতে পড়ে আছি। তাহলে কি কাজ সম্পাদন হওয়া সম্ভব? না, সম্ভব নয়।

তাহলে ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না। আর আপনার মধ্যে ইচ্ছা তৈরি করেছেন এবং আপনাকে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন মহান আল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে আপনি যে ইচ্ছা ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে কাজ করছেন, তা আল্লাহর সৃষ্টি। এজন্য আপনার কাজকর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। আপনি আপনার স্বাধীনত ও ইচ্ছা অনুভব করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন, وَهَدَيْنَاهُ ٱلْمُجْدِينَ “আমি তাকে দুটো পথ প্রদর্শন করেছি।” [সুরা বালাদ: ১০] একটি ভালোর পথ, আরেকটি মন্দের। আল্লাহ আরও বলেছেন, وَفَقَدْ خَابَ مَنْ - وَفَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهُ - “যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে হয় সফলকাম। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে হয় ব্যর্থ মনোরথ।” [সুরা শামস: ৯-১০] আপনার কী করা প্রয়োজন, তা আপনি আপনার অন্তরে অনুভব করেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সত্যনিষ্ঠ আকিদা হচ্ছে, বান্দা নিজের কর্মে স্বাধীন; সে ইচ্ছা করলে এই পথটি গ্রহণ করতে পারে, আবার অন্যটিও গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত বলে দিয়েছেন, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ “কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দিই না।” [সুরা বনি ইসরাঈল: ১৫] আল্লাহ হেদায়েতের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আপনি যদি হেদায়েতের ডাকে সাড়া দেন, তাহলে আপনি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর সাড়া না দিলে হতভাগাদের দলভুক্ত হবেন।

[পরিচ্ছেদ: মানুষের ইচ্ছা ও কর্মস্বাধীনতা-সহ সমগ্র তাকদির-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা]

এখন কেউ বলতে পারে, আপনি যে বিষয়টি আলোকপাত করছেন, তা কি এখন আছে? আর এসব আলোচনা কি ফলপ্রসূ হবে?

আমরা বলব, হ্যাঁ, কিছু সময় খুবই ফলপ্রসূ হবে। কেননা আমরা অনেক মানুষকে দেখি, যারা তাকদিরের দোহাই দেয়। আপনি তাকে বলেন, ‘তুমি সালাত পড় না কেন?’ সে বলবে, ‘আল্লাহ আমাকে হেদায়েত দেননি!’ ‘সেটা কীভাবে?’ সে বলে বসবে, ‘হেদায়েত দিলে তো সালাত পড়তাম।’ অথচ আল্লাহ আপনাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। আপনাকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনি নিজে তা অনুসরণ করেননি। তাহলে বলুন, কীভাবে আপনি নিজের দোষ ও কলঙ্কে ডিফেন্ড করতে গিয়ে এ কথা বলে হুজ্জত করেন যে, আল্লাহ না চাওয়ায় আপনি হেদায়েত হননি?!

শরয়ীভাবে আল্লাহ আপনাকে হেদায়েতের পথে চলতে বলেছেন, কিন্তু আপনি সে পথে চলতে অস্বীকার করেছেন। আর তাই আপনি হেদায়েত পাননি। তাহলে ‘আল্লাহ চাইলেই হেদায়েত দিতে পারতেন’—এমন কথা বলে আপনি দলিল পেশ করতে পারছেন না। আর এই যুক্তি দিয়ে আপনার সাথে যে বিবাদ করতে আসে, অবশ্যই আপনি তার সাথে আলোচনা করবেন এবং তাকে পরাভূত করবেন। ফলে তার ওপর হুজ্জত (দলিল) কায়েম হয়ে যাবে।

বর্তমানে জাবারিয়াদের মতাদর্শ মূলত হাদাসিদের অতিপ্রচলিত মতাদর্শে কিংবা কার্টারের মতো কতিপয় পশ্চিমার মতাদর্শে পরিণত হয়েছে; যারা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা বলে, মানুষই সব করে, মানুষই সকল কাজের কাজি। ফলে তারা তাকদির অস্বীকার করে। তাদের মতানুসারে মানুষই সব করে, তাই আপনি যা চান তাই হবে, আপনি যা চান না, তা হবে না। এই আকিদা বর্তমানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর হাদাসিদের বিশ্বাস, চালচলন ও রীতিনীতি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নিয়তির ব্যাপারে অস্তিত্ববাদীদের আকিদা পোষণ করে। এজন্য এ ব্যাপারে সজাগ থাকুন।

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রাতিচ্যকে দুভাগে ভাগ করেন, তাহলে দেখবেন, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশের রাফেজি-শিয়ারা তাকদিরের আকিদায় মুতাজিলা। তালিবুল ইলমরা কীভাবে তাদের রদ করবে? মানুষের আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞ হলে তো তা সম্ভব হবে না। তাই তাদেরকে জানতে হবে, যাতে তারা (ভ্রান্ত আকিদার) রদ করতে সামর্থ্যবান হয়।

তদনুরূপ আশআরিরাও দারস দেওয়া-নেওয়া করছে। কখনো কখনো তারা (সহিহ আকিদার) সমালোচনা করছে। কখনো এমন সব বিষয় আলোচনা করছে, যেগুলোর ব্যাপারে সজাগ হওয়া দরকার। তাই অবশ্যই একজন ছাত্রকে তাদের আকিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। আবার এমন কিছু বই আছে, যেগুলোতে বাতিল মতাদর্শ পুশ করা হয়েছে।

এখন (কুরআন, হাদিস, কিংবা তাফসির পড়তে গিয়ে) ‘তৌফিক’ শব্দটি আপনার দৃষ্টিগোচর হলো। তারা আপনার কাছে এর অর্থ করবে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, ‘তৌফিক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।’ কিংবা কুরআনে এসেছে, ‘আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো তৌফিক নেই।’ [সূরা হুদ: ৮৮] বাতিল ফের্কা আশারিরা তৌফিকের কী ব্যাখ্যা করে? তারা ব্যাখ্যা করে, তৌফিক মানে কুদরত বা শক্তি-সামর্থ্য। তাদের মতানুসারে আসলে তাদের স্বতন্ত্র কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই, ইমানের প্রতি ভালোবাসা ও খাস হেদায়েতও নেই। এখানে আল্লাহ বান্দাকে তৌফিক দিলেন, এর মানে আল্লাহ তাকে সামর্থ্যবান করলেন। সে শুধু আল্লাহর শক্তির ক্ষেত্র মাত্র। এটা আশারিদের মতবাদ।

আমি মুতাজিলাদের তাফসিরে পড়েছি, তারা বলে, তৌফিক মানে সাহায্য করা (الإعانة)। সুতরাং ‘আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো তৌফিক নেই’, এর মানে আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো সহায়তা নেই। তাদের এই ব্যাখ্যা করার কারণ কী? কারণ এর মূলে রয়েছে কুদরত-তত্ত্ব। মহান আল্লাহ বান্দার কর্ম সৃষ্টি করেছেন। আর কুদরতও আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তারা বলে, এজন্য কোনো কাজ করার সক্ষমতা-সহযোগিতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। (যেখানে বান্দা কর্মক্ষেত্র মাত্র – অনুবাদক)

সুতরাং হে তালেবুল ইলম, আপনি কী পড়ছেন, তা খেয়াল করুন। তাহলে আহলুস সুন্নাহর আকিদা বিষয়ক জ্ঞান আপনার আকল-বিশ্রান্তিকর বাতিল আকিদা থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। বিদআতীদের ব্যাপারে এখানে অনেক দীর্ঘ কথা বলা যাবে। আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করলাম।

[পরিচ্ছেদ: মুমিনের জীবনে তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবনীয় প্রভাব]

এখন আমরা আল্লাহর তাকদির ও ফায়সালার প্রতি ইমানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা আল্লাহর তাকদির ও ফায়সালার প্রতি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের অন্তরে এর প্রভাব কী? তাকদিরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস কি মানবজীবনে গুরুতর কোনো প্রভাব ফেলে? তাকদিরের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসীর জন্য কি ওই ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সম্ভব, যে বিশ্বাস করে না?

হ্যাঁ, এর প্রভাব রয়েছে। আমরা আহলুস সুন্নাহর যে আকিদা, ইমানের মূলনীতি উল্লেখ করেছি, তা স্রেফ মস্তিষ্কপ্রসূত বাচনিক আলাপ নয়। এ আলোচনা মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। যেমন আল্লাহর অনুবর্তী হওয়া, তাঁকে ভালোবাসা ও তাঁর সম্পর্কে জানার মতো মহান বিষয়ের সাথেও তা মিশে

আছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই তারা তাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হবে এবং তাঁকে ভালবাসতে শিখবে। তাহলে এর প্রভাব ও পরিণতি আসলে কী?

প্রথমত, তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস মানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস। আপনি তাকদিরের প্রতি ইমান এনেছেন, এর মানে আপনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ বলেছেন, شَيْءٌ فَعْدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।” [সূরা হাশর: ৬] ফলে কোনো কিছুই আপনার কাছে কঠিন মনে হবে না। কারণ আপনি মহান আল্লাহর নান্দনিক নাম ‘কাদির’ এর প্রতি ইমান এনেছেন।

তাকদিরের প্রতি ইমান মানে—আল্লাহর রুবুবিয়াত তথা মহান সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাস। কেননা আল্লাহই যাবতীয় বিষয়ের পরিচালক। তাকদিরের প্রতি আপনার ইমান যখন পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তখন আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনিই আপনার মহান রব, আর আপনি তাঁর গোলাম। তাঁর রাজত্বে কেবল তাঁরই হুকুম চলে, যেখানে আপনি একজন দুর্বল-অসহায় বান্দা। তাহলে দুর্বল-নিঃস্ব বান্দা কার অভিমুখী হবে? অবশ্যই সে বিস্ময়চকিত্তে ও সর্বান্তকরণে তাঁর অভিমুখী হবে, যিনি মহান শক্তিদর ও প্রতাপশালী রব।

সুতরাং তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে, আপনি খুবই দুর্বল, অসহায়, প্রতিটি কাজে আপনি আল্লাহর মুখাপেক্ষী। যেই আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ سَتَرٌ لِّعَلْمِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ “যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং স্বীয় জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।” [সূরা তালাক: ১২] এটা তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ফল। তাকদিরের প্রতি ইমান আপনার যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর প্রতি ইমান তত বেড়ে যাবে।

কোনো বিপদে পড়লে আপনি বুঝবেন, এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তখন আপনি তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং ইমানের বলে বলীয়ান হবেন। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ফলে মহান আল্লাহর প্রতি আপনার ইমান বেড়ে যাবে। এজন্য আপনি দেখতে পাবেন, যারা বিশ্বাস করে, তাকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তাদের ইমানের লেভেল অনেক উঁচুতে। খেয়াল করলে দেখবেন, আল্লাহর প্রতি তাদের প্রীতি-ভালোবাসা, আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার ঐকান্তিকতা এবং তাঁর পরিচিতি বিষয়ক জ্ঞান-গরিমা তাঁদের অনেক অনেক বেশি থাকে, অন্যান্য মানুষের চেয়ে।

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নার আকিদা অনুযায়ী আমরা বলি, তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস উপায় অবলম্বনের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, “আমরা এক তাকদির থেকে ফিরে আরেক তাকদিরের দিকে যাচ্ছি।” তাই আপনাকে অবশ্যই উপায় অবলম্বন করতে হবে, এটাও আপনার তাকদির-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কার্যকারণ সম্পাদন করাও আল্লাহর তাকদিরের আওতাভুক্ত। আপনি কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে ঐ সত্ত্বার প্রতি ভরসা করবেন, যিনি চিরঞ্জীব ও অমরগণশীল।

এ বিশ্বাসই হবে আপনার জীবনের চালিকাশক্তি। এর ফলে আপনি কাজে নিয়োজিত হবেন এবং ফল লাভ করবেন। তাতে এ উম্মাহ শক্তিশালী হবে। আর এজন্যই সাহাবিগণ একে অপরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতেন না। তাঁরা তাকদির বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা মনে করতেন না, আল্লাহ আমাদের ওপর

আসমান থেকে সোনা বর্ষণ করবেন। বরং আবশ্যিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে, এবং উৎপাদনকার্যে মনোযোগ দিতে হবে।

আহলুস সুন্নাহ কর্মফলকে বিন্যস্ত করে কাজের ওপর। তাই তাদের তাকদির-বিশ্বাস মানবতাকে করে তোলে উজ্জীবিত, শক্তিশালী ও কঠোর পরিশ্রমী। সমগ্র উম্মত ও তার প্রত্যেক সদস্য কাজকর্মে ব্রতী হয়। আপনি মুসলিমদের পশ্চাদ্গামিতার সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, তারা কাজ করত না। বলত, আল্লাহই আমাকে খাওয়াবেন, ইনশাআল্লাহ। অথচ আল্লাহ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিবেন, আপনার জীবিকার বন্দোবস্ত করবেন।

কিন্তু আপনি যদি ঘোষণা দেন, ‘নভোমণ্ডল থেকে আমার জন্য সোনারূপা নাজিল হবে’, তাহলে কীভাবে হয়, বলুন? আল্লাহ বলেছেন, *فُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ* “আপনি বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে প্রমাণ উপস্থিত করো।” [সূরা বাকারাহ: ১১১] আসলে আপনার অলীক দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

সুতরাং তাকদিরের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, কাজের ফল কেবল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তাই আপনাকে উপায় অবলম্বন করতে হবে, আর কাজে ব্রত হতে হবে। মনে রাখবেন, উপায় অবলম্বন করা তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। তাই আপনি কাজকর্মে পরিশ্রমী হোন। সেই সাথে জেনে রাখুন, সবকিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বর্ণনা অনুযায়ী, তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের ফলে বান্দার অন্তর আল্লাহর প্রতি প্রশান্ত হয়। সে বিপদে পড়লেও সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করে। আবার কল্যাণপ্রাপ্ত হলে দাম্ভিক বনে যায় না, অতি-আনন্দিত অপরাধী হয় না। সে জানে, সবকিছু দেওয়ার মালিক আল্লাহ। প্রাপ্ত কল্যাণটুকু যেমন তার জন্য পরীক্ষা, তেমন বিপদ-আপদ-দুর্যোগও তার জন্য যাচাই-নিরীক্ষা। ইরশাদ হয়েছে, *وَالْخَيْرُ فِتْنَةٌ وَالْيَنَّا تُرْجَعُونَ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ* “আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” [সূরা আশ্বিয়া: ৩৫]

সে জানে সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হয়। তিনি বলেছেন, “তাদের কোনো কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তাহলে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দিন, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কী হবে, যারা কখনও কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না? আপনার যে কল্যাণ হয়, তা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।” [সূরা নিসা: ৭৮-৭৯]

মহান আল্লাহ সূরা নিসায় বলেছেন, “আপনার যে কল্যাণ হয়, তা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।” এই আকিদা যখন অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তখন অন্তর হয় প্রশান্ত। ঐশ্বর্যবান হয়েও সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় না। আবার দরিদ্র হলেও সে চিন্তা-বিপর্যস্ত ও আশাহত হয় না। তাকে কেবল এতটুকু জানতে হবে, কাজ করা তার জন্য অপরিহার্য, আর বাকিটুকু আল্লাহর ওপর সোপর্দিত।

তাকদির-বিশ্বাসের প্রভাবটা লক্ষ করেন। এ বিশ্বাস ইমানদারদের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা তৈরি করে। তাইতো সাহাবিগণ যখন তাকদিরের প্রতি যথোচিত ইমান আনয়ন করেছেন, তখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। একজন আরেকজনকে যে হিংসা করে, এটা কোথা থেকে আসে?

হিংসুক লোক বলে, ‘আরে, এ দেখি বাড়ি বানিয়ে ফেলল! সে কাজ করল, আর ধনী হয়ে গেল! আমি বুঝতে পারছি না, সে এত সম্পদ পেল কোথায়?’

আবার একজনের যা আছে অন্যের তা না থাকলে, সে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়। মনেপ্রাণে কামনা করে, আল্লাহ তার ভাইকে দেওয়া সামগ্রী ছিনিয়ে নিন। আসলে সে তাকদিরের প্রতি যথোচিত ইমান আনতে পারেনি। কেননা তার ভাইকে যা দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে সে যখন হিংসাবশত ওই ভাইয়ের ধ্বংস কামনা করে, তখন সে যেন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে।

তাকদিরের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকলে সে মনে করত, তার ভাইয়ের কাছে যা এসেছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। সেই নেয়ামত তার জন্য পরিক্ষাস্বরূপ। আর আপনি যে পাননি, সেটাও একটা পরিক্ষা। কখনো কখনো কন্মের মধ্যেই কল্যাণ থাকে, যেমন বেশির মধ্যও থাকে অকল্যাণ।

এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস অন্তর থেকে হিংসা দূরীভূত করে। কেননা সে জানে, যদি তাকে হিংসা করে, তাহলে সে আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধবাদী হয়ে যাবে। এজন্য সে আর মানুষকে হিংসা করবে না। আল্লাহ বলেছেন, *عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ* “নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, সে বিষয়ের জন্য তারা মানুষকে হিংসা করে?” [সূরা নিসা: ৫৪] হিংসা বড়ো নিন্দার কাজ। হিংসা ভালো আমলকে গলাধঃকরণ করে, যেমন আগুন গিলে ফেলে কাঠখড়ি।

কেননা তাকদিরের প্রতি ইমানের জন্য হিংসা একটি ক্রটি, অন্তরায়। মনে রাখা উচিত, আল্লাহই দেন, আবার আল্লাহই বঞ্চিত করেন। তাহলে হিংসা কেন? হৃদয়ে যখন তাকদিরের বিশ্বাস হবে দৃঢ়মূল, হিংসা-বিদ্বেষ তখন হয়ে যাবে ধূত-অপসৃত। ইমানদাররা দুনিয়াতেই ভাই ভাই হয়ে স্ব স্ব আসনে সহাবস্থান করবে। আর আখেরাত, সে তো আরও মধুর! তারা থাকবে একসাথে, শাহী পালঙ্কে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে। আমরা মহান আল্লাহর বদান্যতা কামনা করছি।

এগুলো তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসের কিছু ফল ও পরিণতি, এর আরও কতগুলো ফল ও উপকারিতা আছে। কিন্তু কলেবর সংক্ষেপ করার জন্য সেগুলো উল্লেখ করা যাচ্ছে না। এ থেকেই আহলুস সুন্নাহর বর্কতময় আকিদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। এ যেন জ্যোতির ওপর জ্যোতি, এ আকিদা অন্তর ও কন্মের জ্যোতি; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির্ময় পথ দেখান। যে তা গ্রহণ করে, সে বিশাল ঐশ্বর্যই গ্রহণ করে।

বিশেষ করে তালিবুল ইলমরা অন্য যে কোনো বিষয়ের চেয়ে তাওহিদকে এবং তাওহিদের আলোচনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিবে। কেননা এ জ্ঞান আল্লাহ-সম্পর্কে জানার জ্ঞান। আর যে কোনো জ্ঞান তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের বদৌলতেই শরাফত অর্জন করে। তাই সবার সেরা জ্ঞান মূলত তাওহিদের জ্ঞান। এজন্য যারা অন্য বিষয়ের ওপর যেরূপ গুরুত্ব দিচ্ছে, অথচ তাওহিদের প্রতি সেরূপ গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাদের কাজটি ক্রটিপূর্ণ।

তাহলে আপনি কীভাবে আল্লাহর গুণবিষয় তাকদির নিয়ে তত্ত্বতালাশ করেন? এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ‘তা-ইতাহিল কাদারিয়াহ’ নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে তিনি মুসলিমদের মাঝে তাকদির নিয়ে সংশয় সৃষ্টিকারী জনৈক জিম্মি ইহুদির খণ্ডন করেছেন।

এ বিষয়ে ভ্রষ্টতার আসল কারণ কী তা তিনি বয়ান করেছেন। যা থেকে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি এবং নিজেকেও সাবধান করছি। শাইখুল ইসলাম বলেছেন, *وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ~ هو الخوض في فعل* ‘সব ফের্কার ভ্রষ্টতার মূল আছে যে কারণ, তা হচ্ছে রবের কর্মের হেতু-ইল্লাত অন্বেষণ।’

আল্লাহ এটা কেন করলেন, কীভাবে করলেন—এমন প্রশ্ন করা হয়। অথচ এগুলো আল্লাহর সৃষ্টির গোপন বিষয়। আপনি কি আল্লাহর ফায়সালার বিরুদ্ধাচারণ করতে চান? না কি তাঁর মতো জানতে চান? আরে ভাই, আপনি তো তাঁর পালিত-নগণ্য বান্দা মাত্র। শাইখুল ইসলাম বলেছেন, *حكمة له ~ فصاروا على فإنهم لم يفهموا* ‘তাদের বুঝে আসে না রবের হিকমাহ বিভিন্ন, তাই তো সে হয়ে যায় জাহেলিয়াতে বিপন্ন।’

তারা আল্লাহর হিকমাহ বুঝে না। আসলে সৃষ্টিকুল যদি আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞা জেনেই যেত, তাহলে তাদের মধ্যে আর রবের মধ্যে পার্থক্য কী থাকত?

এখন আপনারা একটু মুসা ও খিজির (আলাইহিস সালাম) এর কথা খেয়াল করুন। খিজির (আলাইহিস সালাম) বিদ্যাবত্তায় মুসা (আলাইহিস সালাম) কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যা মুসার জানা ছিল না। তিনি নৌকা ফুটো করে দিলেন। মুসা কেবল বাহ্যিক দিকটাই দেখলেন। ‘আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ফুটো করে দিলেন? নিশ্চয় আপনি বড়োই গুরুতর মন্দ কাজ করলেন।’ [সূরা কাহফ: ৮১]

মুসা জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য আপনি তাতে ছিদ্র করলেন? অথচ এতে তাদের জন্য কল্যাণ ছিল, যা তিনি জানতেন না। মুসা একজন নবি হয়েও তা জানতেন না। কিন্তু খিজির জানতেন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের কথা। মহান আল্লাহ বলেছেন, *لَدُنَّا عِلْمًا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ* ‘যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম, আর আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান।’ [সূরা কাহফ: ৬৫]

এরপরে খিজির এক বালককে হত্যা করলেন, যে খেলাধুলা করছিল। সুবহানআল্লাহ। মুসা বললেন, ‘আপনি প্রাণের বিনিময় ব্যতিরেকেই একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন!’ [সূরা কাহফ: ৭৪] মুসা দুঃখিত হয়ে যাচ্ছেন, কেবল তাই জানেন। অাভ্যন্তরীণ বিষয় তো তাঁর জানা নেই। আর জানবেনই বা কী করে?! তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটা বালককে আপনি হত্যা করে দিলেন?

তৃতীয় পর্যায়ে খিজির এক গ্রামে গেলেন। তিনি সেখানে মেহমান হিসেবে থাকতে চাইলেন। কিন্তু তারা মেজবানি করতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, আমরা তোমাদের মেজবানি করব না। তখন খিজির সে গ্রামের একটি ভূপতিত দেওয়াল সোজা করে দিলেন। মুসা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ‘আপনি ইচ্ছা করলে তো তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন।’ [সূরা কাহফ: ৭৭]

অর্থাৎ আপনি তাদের থেকে বিনিময় নিন। কেননা তারা আমাদের সম্মান করেনি। অথচ আপনি তাদের ভালো করছেন! মুসা বাহ্যিক দিক দেখেছেন। আর খিজিরের আছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। যদিও তার কাজ বাহ্যিক দিক থেকে ভালো না, কিন্তু তাতে রয়েছে আল্লাহর প্রজ্ঞা। তিনি খিজিরকে পাঠিয়েছিলেন মুসার জ্ঞানের স্বল্পতা বোঝাতে। কারণ মুসা বলেছিলেন, ‘আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।’ তাঁকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করতে পারেন।

দুই সৃষ্ট বান্দা—মুসা আর খিজিরের জ্ঞানের মধ্যে যদি এমন পার্থক্য হয়, তাহলে আপনার এবং আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কেমন পার্থক্য হতে পারে? আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার সাথে আপনার জ্ঞান ও ক্ষমতার তুলনাই হতে পারে না। তাহলে আপনি গোপন জিনিস জানবেন কীভাবে? আর কীভাবে হলো, তাই বা জানবেন কী করে?

তাই আপনারা ‘কীভাবে হলো এবং কেন হলো—এমন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকুন। এগুলো শয়তান প্রবেশদ্বার। এসব থেকে নিজেকে বাচিয়ে চলুন। আর উক্ত ঘটনটি স্মরণ করুন। প্রত্যেক শুক্রবারে (সূরা কাহফ) পড়ুন। জানুন, তাতে কী কী প্রামাণিকতা, উপদেশ, আর প্রজ্ঞা আছে। ব্যাপারটা খেয়াল করুন, মানুষ হয়ে মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানতে পারে না, কর্মের হকিকত উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়, বরং সেই কাজের ব্যাপারে আপত্তি করে। অথচ ওই কাজেই রয়েছে কল্যাণ, ওই কাজেই রয়েছে হিকমাত।

সুতরাং আল্লাহর কর্মাবলি দেখে আপনার স্বল্প সমঝ আর সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে চান কীভাবে? নিঃসন্দেহে এ কাজ চরম ভ্রষ্টতার নামান্তর। মহান আল্লাহ তার পূর্ণ প্রজ্ঞায় মাখলুকের থেকে বিলকুল আলাদা। আল্লাহ বলেছেন, “আপনি বলে দিন, অতএব পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন।” [সূরা আনআম: ১৪৯]

তিনি আরও বলেন, أَفَلَا يَسْمَعُونَ “আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ বেশি জানেন?” [সূরা বাকারাহ: ১৪০] নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদের ও তোমাদের হেদায়েতের পথ আলোকিত করে দেন, আমাদেরকে পরহেজগারদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর আমাদের সন্তানসন্ততিদের তৌফিক দেন, তাঁকে রাজিখুশি করার তৌফিক।

আমাদের মাঝে যে বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তিনি সঠিকতা দান করুন, আর যে গাফিল, তাকে হেদায়েত দিন। আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, পাশাপাশি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করার তৌফিক দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাদের নবি মুহাম্মাদের ওপর দয়া ও শান্তির বারিধারা বর্ষণ করুন।

তথ্যসূত্র: www.mimham.net/tan-4044-42।

আহলুস সুন্নাহর তাকদির বিশ্বাস [প্রশ্নোত্তর পর্ব]

[১]. প্রশ্ন: আল্লাহ তাকদির নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলে সেসব হাদিসের ব্যাপারগুলো কেমন হবে, যেসব হাদিসে বলা হয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বৃদ্ধি পায়? অনুরূপভাবে দোয়ার ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে (দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তিত হয়), সেসব বর্ণনার কী হবে?

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন, আবার যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আর মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই আছে।” [সূরা রাদ: ৩৯] তিনি বলেছেন, “আর মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই আছে।” অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ। আর লাওহে মাহফুজে যা আছে, তা কখনো পরিবর্তন হবে না। সেখানে যা আছে তা হবেই।

আর যখন আল্লাহ ফেরেশতাকে আপনার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন ফেরেশতা একটি ‘কিতাব’ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এর মধ্যে আপনার বয়স লিখে রেখেছেন। এরপর যখন আপনি সৎকর্ম করবেন, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবেন, নবি ﷺ যা বলেছেন তা করবেন, তখন আপনার পরিণাম পরিবর্তিত হবে, এবং হায়াত বেড়ে যাবে। কেননা আল্লাহ ফেরেশতাদের কিতাবে যা আছে তা মিটিয়ে দিবেন এবং ভিন্ন সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ ওই কিতাবে আপনার শেষ পরিস্থিতি যা নির্ধারণ করেছেন, তার ভিত্তিতেই ফেরেশতাবর্গ আপনার জান কবজ করবেন।

পক্ষান্তরে লাওহে মাহফুজে—মূলগ্রন্থে—যা রয়েছে, তা কখনো পরিবর্তিত হবে না। আর ফেরেশতাদের কাছে যে কিতাব আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন, আবার যা ইচ্ছা বহাল রাখেন।” তদনুরূপ দোয়ার মাধ্যমেও একই ব্যাপারটি হয়। এছাড়া যেসব হাদিসে তাকদির পরিবর্তনের কথা এসেছে, তা দ্বারা মূলত ফেরেশতাদের হাতে থাকা লিখিত কিতাব পরিবর্তনের কথাই বুঝানো হয়েছে। আর লাওহে মাহফুজের লেখায় কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না।

[২]. প্রশ্ন: কেউ যদি দোয়া করে, ‘হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে তাকদিরের পরিবর্তন চাই না, বরং আমরা তাতে শুধু তোমার দয়া বা কোমলতা চাইছি,’ তাহলে কি তার দোয়া বিশ্বুদ্ধ হবে? আর এর অর্থই বা কী?

উত্তর: এই দোয়ার বিশ্বুদ্ধতার ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে দোয়ার অর্থ কখনো কখনো সঠিক হতে পারে। কেননা আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। এটা যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে তার পরিবর্তন না চাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটা তাকদিরের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকার আওতাভুক্ত। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে চাইতে পারে, তার তাকদিরে যেন দয়া করা হয়। আর আল্লাহ দয়াবান-সুন্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে অবহিত। মহান আল্লাহর ‘আল-লাতিফ (সুন্মদর্শী/দয়াবান)’ নামের যথার্থতা হচ্ছে, তিনি বান্দার জন্য ভালো-মন্দের ফায়সালার ক্ষেত্রে দয়ালু ও সুন্মদর্শী হবেন।

ফায়সালা যদি আপনাকে স্পর্শ করে দয়া ও অনুগ্রহের সাথে, আর আপনি নিজেও সে ফায়সালার প্রতি কোমল থাকেন, তাহলে আপনার ওপর ফায়সালা আসবে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে, আর আপনি সে ফায়সালার প্রতি বিশ্বাসী ও সন্তুষ্ট থাকবেন। জ্ঞাতব্য যে, ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকার পাশাপাশি তাকদিরের ওপরও সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা অত্যাবশ্যক ফরজ কাজ। যেহেতু এটি (তাকদির-ফায়সালা) আল্লাহর কর্ম। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে আপত্তি তোলা কিংবা তা অপছন্দ করার অধিকার কারও নেই।

বলা বাহুল্য, অনেক বাস্তবায়িত ফায়সালার—যেমন রোগাক্রান্ত হওয়া, সম্পদের বিনাশ প্রভৃতি—প্রতি কেউই সন্তুষ্ট থাকে না। কিন্তু যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, এই রোগাক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কর্ম, আল্লাহরই ফায়সালা, তাহলে আপনি এতে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং এই পরিণতি মেনে নিবেন। এ কাজ ওয়াজিব। কেননা উক্ত ফায়সালা আল্লাহর কাজ। আর আপনি বান্দা হয়ে আল্লাহর কাজের প্রতি আপত্তি পেশ করতে পারেন না।

পক্ষান্তরে যে রোগ আপনাকে পীড়া দিচ্ছে, সেটা মাখলুক। আর এ মাখলুককে আপনি কখনো কখনো অপছন্দ করতে পারেন। এতে আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আপনার ইমানের কোনো ক্ষতি হবে না। আরোপিত বিষয়ের (বিপদআপদ) ওপর পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা সালিহিন তথা বুজুর্গ লোকদের স্তর। তাঁরা সমস্ত বিষয়ের ওপর সন্তুষ্ট

থাকেন। এ স্তর সবার জন্য নয়। তাই যে ব্যক্তি বিপদের প্রতি অসম্ভুত থাকে, তার পাপ হয় না। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালাকে অপছন্দ করলে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। কারণ ফায়সালা যে আল্লাহর কাজ। আর আল্লাহর কোনো কাজকে অপছন্দ করার অধিকার কারও নেই।

[৩]. প্রশ্ন: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘ওই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, নিশ্চয় তোমাদের কেউ জালাতি আমল করে, এমনকি তার মাঝে আর জালাতের মাঝে এক বিষত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় তার কিতাব (ভাগ্য) এগিয়ে আসে, ফলে সে জাহান্নামী হয়ে যায়।’ এ হাদিসের ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলেছি, তাকদির পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে এবং কিতাবও, যা আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী বান্দার জন্য অনেক পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; যাতে বলা আছে, আপনার এ পরিণাম অবশ্যই ঘটবে। আল্লাহ জানেন, আপনি শুরু-জীবনে আল্লাহর আনুগত্য করবেন। আনুগত্যের এ বিষয়টি লিখিত আছে। আর আপনি শেষ জীবনে অবাধ্য হবেন, তাও আল্লাহ জানেন এবং এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এখন আপনার কিতাবে যা লেখা আছে, তা-ই আসবে, কেননা তা আল্লাহ জানেন। আর কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের পর। আল্লাহর জ্ঞান আদি ও চিরন্তন, যার কোনো শুরু নেই। আপনার ক্ষেত্রে যা ঘটবে তা আল্লাহ জানেন।

তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী আপনি ভালো কাজ করবেন। আর আপনার পরিণাম হিসেবে দুর্ভাগ্য লেখা থাকলে আপনি অচিরেই দুর্ভাগা হবেন এবং ভ্রষ্টতার পথ বেছে নিবেন। ভ্রষ্টতার পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারটিও আপনার নিজের এখতিয়ারে হবে। ওই পথে সে ঝুঁকে পড়বে এবং ওতেই তার শেষ পরিণতি হবে। এটাও লাওহে মাহফুজে লেখা আছে। কেননা আপনার আগে-পরের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ জানেন।

তদনুরূপ ভ্রষ্ট কাফেরের শেষ পরিণতি ভালো হতে পারে। আল্লাহ জানেন, এর অন্তর হেদায়েতের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে, ওই পথই সে অন্বেষণ করবে এবং রাসুলের ডাকে সাড়া দেওয়ার পথ তলাশ করবে। তার অন্তরের স্বাধীনতা আছে। সে এই পথ তলাশ করবে, তা মহান আল্লাহ জানেন। সে হেদায়েতের শিক্ষা গ্রহণ করবে, আল্লাহর কিতাব বুঝবে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিবে, এবং এসবে অবিচল থাকবে।

এটা তার শেষ পরিণতি, এর ওপরই সে মারা যাবে। বাহ্যিক দিক থেকে মনে হতে পারে সে কাফের। সালাত আদায় করে না, আত্মশুদ্ধি অর্জন করে না। কিন্তু আল্লাহর নিকটে সে সিদ্দিকদের একজন হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কেননা আল্লাহ জানেন, সে অচিরেই হেদায়েত লাভ করে তার ওপরেই মৃত্যুবরণ করবে।

আমরা কত লোক দেখলাম, যারা ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ! কিন্তু আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিয়েছেন, ফলে তারা আল্লাহর পথে শহিদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। কেননা কী ছিল এবং কী হবে তার সবই আল্লাহ জানেন। তাই উক্ত হাদিসের সমঝ মহান আল্লাহ সব জানেন ও সবকিছু লিখে রেখেছেন, সেই স্তরদুটো বোঝার ওপর নির্ভরশীল।

[৪]. প্রশ্ন: আমরা বলছি, ‘উপায় অবলম্বন করা ওয়াজিব।’ আবার রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জালাতে যাবে।’ তাদের গুণ বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘তারা ইকতিওয়া করবে না,

ঝাড়ফুক করবে না এবং তাদের রবের ওপর ভরসা করবে।' তাহলে উক্ত দুই বক্তব্যের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা হবে?

উত্তর: হাদিসে বলা হয়েছে, তারা ইকতিওয়া করবে না। এখানে ইকতিওয়া অর্থ—আগুনে সেক দেওয়া, যা এক ধরনের চিকিৎসা। এর দ্বারা আরোগ্যলাভের কারণ ঠিক স্পষ্ট নয়। নবীজি ﷺ এটাকে উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এর সাথে অন্তরের সংশ্লিষ্টতা মূলত কার্যকারণ বা উপায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার ন্যায়, যা ঠিক স্পষ্ট না। এর মাধ্যমে আরোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্য নয়।

নবী ﷺ বলেছেন, 'আরোগ্য লাভ হয় তিনটি পদ্ধতিতে।' সেখানে উল্লেখ করেছেন, 'আগুনের সেক দিয়ে।' তবে তিনি বলেছেন, 'আমি সেক দেওয়া পছন্দ করি না।' এটা সুবিদিত যে, আগুনে সেক দেওয়ার পদ্ধতি চিকিৎসার সুস্পষ্ট মাধ্যম নয়। তাই যে ব্যক্তি এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, সে ধারণা করে, এই সেক তার উপকার করছে এবং এটা উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনের একটি মাধ্যম।

এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তাদের অনেকেই আরোগ্য লাভ করেছেন। তবে অনেকে বলেন, সরাসরি সেকের কারণেই আরোগ্য লাভ হয়েছে। এমন ধারণা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা ওয়াজিব কিংবা নিদেনপক্ষে মুস্তাহাব। এজন্য যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আজাবে জান্নাতে যাবে, তাদের অন্তর 'সুস্পষ্ট মাধ্যম নয়' এমন বিষয় থেকে মুক্ত হবে। তাইতো বলা হয়েছে, তাদের অন্তর গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। আর সেক দেওয়া আরোগ্য লাভের সুস্পষ্ট মাধ্যম বা উপায় নয়।

তদ্রূপ ঝাড়ফুক চাওয়াও ভালো নয়। কেননা তা আল্লাহকে পরিত্যাগের একটি মাধ্যম। নিজেই ঝাড়ফুক করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। কিন্তু আপনি যদি ঝাড়ফুক চান, অথবা তা নিতে যান, তাহলে কোনো সমস্যা নাই। তবে তা না চাওয়াই এমন মর্যাদাপূর্ণ স্তর (বিনা হিসাবে জান্নাত) লাভের উপায়। আর বাহ্যিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয় হাসিল করার ব্যাপারে নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা চিকিৎসা নাও, তবে হারামের মাধ্যমে নয়।' স্বয়ং নবী ﷺ চিকিৎসা করেছেন এবং চিকিৎসা নিয়েছেন।

আলোচ্য হাদিস এবং ঐ হাদিসসমূহ, যেগুলোতে চিকিৎসার আদেশ দেওয়া হয়েছে অথবা উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে সমন্বয়ের কথা আমি আপনাদের বললাম, যা আলেম উলামা বলেছেন।

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ সব ধরনের চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা নেননি। উপায় বা মাধ্যমের মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁরা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا مَرَضْتُ فُهِوْ يَشْفِينِ, "আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।" [সূরা শুয়ারা: ৮০] ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ। ইবরাহিম বলেছিলেন, 'আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।'

তাঁরা এটাকে আমভাবে নিয়েছেন। তাঁরা বলতেন, আল্লাহই রোগ দিয়েছেন, আবার তিনিই আরোগ্য দিবেন। স্রেফ আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁরা আরোগ্যলাভের উপকরণ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এটি বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ কাজ হলো, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে উপায় অবলম্বন করবেন, যদি উপায়টি প্রকাশ্যভাবে উপকারে আসে। অনেক সময় সেক মানুষের কাজে আসে না। আবার নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সেক পদ্ধতি কাজে আসে।

যে সকল ওষুধ মানুষ ব্যবহার করে, অধিকাংশ সময় আল্লাহর অনুমতিতে তা দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়। তাই ইমানদারদের উচিত, উপায় গ্রহণ করা এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা। তারা মনে রাখবে, এ উপায় অবলম্বন করলেই উদ্দিষ্ট বিষয় হাসিল হয়ে যাবে না। মানে আপনি ওষুধ খেলেন, আর অসুখ সেরে গেল, ব্যাপারটি এমন নয়।

বরং সেটা একটা মাধ্যম মাত্র, যা আরও কতগুলো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। যেমন আপনার শরীর ওই ওষুধ সেবনের উপযোগী হতে হবে। এটা আল্লাহর হাতে। আবার আপনার শরীরে এমন কিছু থাকা যাবে না, যা ওষুধের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট করে ফেল। ফলে এ ওষুধ কোনো উপকারে আসে না। কিছু মানুষ দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছে, কিন্তু তাদের অসুখ সারছে না। এর কারণ তাদের শরীর এ ওষুধের উপযোগী নয়। তাদের শরীরে এমন কিছু আছে, যা ওষুধকে কার্যকরী হতে বাধা দিচ্ছে। বস্তুত আল্লাহই পারেন ওষুধকে ফলপ্রসূ করতে।

ওষুধ গ্রহণের সময় আপনার অন্তর আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এটাও একটা উপায়। ‘গাড়িয়োগে ভ্রমণ’ এর উদাহরণে আমি তা ব্যাখ্যা করেছি। আপনি উপায় সম্পাদন করুন, আর বাকিটুকু আল্লাহর ওপরে ছেড়ে দিন। উপায় অবলম্বনের সময় তাওহিদবাদী মুসলিমের অন্তর উপায়ের ওপর ভরসা করবে না। যেহেতু সে উপায় অবলম্বন করতে আদিষ্ট হয়েছে, সেজন্য তা করবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, তিনি যেন উপায়টির সাথে আরও উপায় যোগ করে দেন। যাতে সে উপকার ও সুস্থতা লাভ করে। এই হাদিসগুলোর মধ্যে এভাবেই সমন্বয় সাধন করতে হবে।

[৫]. আপনি সেই পিতামাতার উদ্দেশ্যে কিছু বলুন, যারা তাদের সন্তানদের জিহাদে যেতে বারণ করছেন, কারণ তারা জিহাদে গেলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাবে।

উত্তর: জিহাদ দুই ধরনের। প্রকাশ্য শত্রুর সাথে জিহাদ দুই প্রকার। যথা: (১) ফরজে আইন (২) ফরজে কেফায়া। জিহাদ তখনই ফরজে আইন হবে, যখন শত্রুরা দেশবাসীর ওপর আক্রমণ করবে। এখন যদি শত্রুরা এসে আমাদের রিয়াদ শহর আক্রমণ করে, তাহলে সবার ওপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে পিতামাতার আনুগত্য চলবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, **الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ بِأَيْهَا** “হে মুমিনগণ, ওই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে।” [সূরা তাওবা: ১২৩]

কেউ যদি দেশে আক্রমণ করে, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া সবার ওপর ফরজে আইন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পিতামাতার আনুগত্য চলবে না।

আর এখন আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। (*) এক্ষেত্রে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া কোনো যুবক জিহাদে যেতে পারবে না। এ অবস্থায় পিতামাতা তাদের সন্তানকে নিজেদের প্রয়োজন অথবা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে জিহাদে যেতে নিষেধ করতে পারে। যেহেতু এক্ষেত্রে জিহাদে যাওয়া ফরজে আইন না। তবে নিষেধ করার কারণে তারা তাকে অনেক কল্যাণ ও জিহাদের ফজিলত থেকে বঞ্চিত করলেন এবং নিজেরাও বঞ্চিত হলেন।

[(*) অনুবাদকের টীকা: এই লেকচারটি অনেক পুরনো। তখন শাইখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের জিহাদে সালাফিরাও অংশগ্রহণ করেছিল। সালাফি উলামাগণ তাদের সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুজাহিদদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই শুরু হলে উলামাগণ তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এমনকি একটি সূত্রে জানা গেছে, শাইখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের ফিতনাময় লড়াইয়ে অর্থ-সামগ্রী ডোনেট করা হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন। টীকা সমাপ্ত]

কিন্তু তাঁদের নিষেধ করার হক আছে। কেননা পিতামাতার অনুমতি ছাড়া নবি ﷺ কাউকে জিহাদের অনুমতি দেননি। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে নফল কেফায়ি জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বলেন, ‘তোমার কি পিতামাতা বেঁচে আছেন?’ সে বলল, ‘জি, বেঁচে আছেন।’ তিনি বললেন, ‘তুমি তাঁদের কাছে ফিরে যাও, সেটাই তোমার জন্য জিহাদ।’ কারণ নবি ﷺ জানতেন, এই সন্তানের কাছে তাঁর পিতামাতার দরকার আছে।

পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে জিহাদে যেতে বারণ করে মূলত তাঁকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন। অবশ্য সন্তানের প্রতি যদি বেশি ভালোবাসা থাকে এবং তাকে তাঁদের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁরা সন্তানকে জিহাদ যেতে বারণ করতে পারবেন।

সকল প্রসংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি তৌফিকদাতা। যিনি আমাদের জন্য এমন শরিয়ত নির্ধারণ করেছেন, যাতে পিতামাতা ও সন্তান সবারই নয়ন জুড়ায়।

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া ও বিনা অনুমতিতে সফর করা সন্তানের জন্য না-জায়েজ; তার এ সফর হারাম। সন্তান সফর করছে অথচ তার পিতামাতা রোদন করছে অথবা তাঁরা তার ওপর অসন্তুষ্ট, এমতাবস্থায় তার সফরে যাওয়া হালাল নয়, না-জায়েজ। কেননা তার জিহাদে যাওয়া ফরজে কেফায়া (যেখানে পিতামাতার আনুগত্য করা ফরজে আইন)। তবে জিহাদ যদি ফরজে আইন হয়, তাহলে পিতামাতার আনুগত্য চলবে না। কেননা নবি ﷺ বলেছেন, ‘স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না।’ এখন আফগানিস্তানে যে জিহাদ চলছে, তাতে মুসলিমদের জিহাদ করা ফরজে কেফায়া মর্মে আলিমগণ ফতোয়া দিয়েছেন। তবে সেখানে আফগানীদের জন্য জিহাদ করা ফরজে আইন।

যদি তারা এতে যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলিমদের ওপর জিহাদ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ বলেছেন, “قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ” ‘তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।’ [সূরা তাওবা: ১২৩] তারাও যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের পরবর্তীদের ওপর ওয়াজিব হবে। কেননা ক্ষতি আসে একের পর এক। একটি সুবিদিত বিষয় হচ্ছে, প্রথমদিকে স্পেন দেশে ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ মর্মে কোনো আলিম ফতোয়া দেননি। তাঁরা বলেছেন, জিহাদ করা সেখানকার অধিবাসীর ওপর ফরজ। তারপর যারা আছেন তাদের ওপর ফরজ হবে। এটা আমাদের দেশের হকপন্থি মুফতিদের ফতোয়া। আল্লাহ তাঁদের হেফাজত করুন এবং আমাদের উত্তম জীবন দান করুন।

[৬] প্রশ্ন: মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত কিছু কথা আছে। যেমন: شاءت الأقدار (ভাগ্য চেয়েছে), وجدت فلانا صدفة (আমি আকস্মিকভাবে অমুককে পেয়ে গেছি)। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: شاءت الأقدار (ভাগ্য চেয়েছে) বলা ঠিক নয়। কেননা ইচ্ছা শুধু আল্লাহর। شاءت الأقدار শব্দটি قدر এর বহুবচন। তাকদিরের তো কোনো ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা তাকদিরের একটি স্তর মাত্র। তাই অবশ্যই বলতে হবে,

মহান আল্লাহ চেয়েছেন। আসলে شاءت الأقدار (ভাগ্য চেয়েছে) কথাটি বাস্তব-মর্ম শূন্য। আবার বাক্য সংযোজনের দিক থেকেও এতে ভুল রয়েছে।

আর قابلته صدفه ومر بي صدفه (তার সাথে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়েছে, সে হঠাৎ আমাকে অতিক্রম করেছে) বা অনুরূপ কথা বললে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা صدفه (অকস্মাৎ, হঠাৎ) শব্দটি সম্বন্ধীয় অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ অর্থটি বুঝায় কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে। মানে সেটা আমার দিক থেকে অকস্মাৎ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দিক থেকে কোনো কিছুই অকস্মাৎ নয়, পৃথিবীর সবকিছুতেই রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞা। আল্লাহর রাজত্বে কোনো কিছুই অকস্মাৎ হয় না, অথচ ভ্রষ্ট প্রকৃতিবাদীরা এমনিই বলে থাকে।

কিন্তু এর দ্বারা যদি নিজের দিকে উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। তবে এসব সংশয়পূর্ণ কথা না বলে সংশয়মুক্ত কথাবার্তা বলা উচিত। যেমন: আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম প্রভৃতি।

[৭]. প্রশ্ন: তাকদিরের ব্যাপারে আমাকে শয়তান খুব প্ররোচনা ও পীড়া দেয়। এতে আমার মনে হতে থাকে, এটা কীভাবে হলো, ওটা কীভাবে হলো? আল্লাহ কেন এটা সৃষ্টি করলেন? এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন। আপনি আমাকে এমন কিছু পছন্দ বলে দিন; যাতে আমি এসব প্ররোচনা থেকে বাঁচতে পারি।

উত্তর: প্রথমত, একজন মুসলিম কোনো ধরনের প্ররোচনা প্রশয় দিবে না। কেননা শয়তানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে আল্লাহবিমুখ করা। সে যখন দেখে কারও ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সংশয় কাজে লাগছে, তখন সে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে। আবার যখন দেখে কেউ কেউ শারীরিক প্রবৃত্তিতে প্ররোচিত হচ্ছে, তখন সে এই পথ অবলম্বন করে। প্রশ্নকারী অবশ্যই এসব চিন্তাভাবনা প্রশয় দিবে না। আমি তাকে উদাহরণ দিচ্ছি। যাতে করে আল্লাহর সৃষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে তার চিন্তাজগত সংশয় থেকে দূরে থাকে।

ধরুন! একজনের কাছে ছোটো বাচ্চা—তার সন্তান অথবা ভাই—আছে। সে বাচ্চার বড়ো ভাই তার দেখাশোনা করে। ছোটো ভাই বড়ো ভাইকে তার (ছোটো) দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখে। সে বড়ো ভাইকে পুরোপুরি বুঝতে পারে না। কেননা তার সমঝ স্বল্প। তার ভাই তার থেকে বিশ বছরের বড়ো। আর তার জ্ঞানও বিশ বছর বেশি। তো এই ছোটো বাচ্চাটিকে যদি তার পিতা ইনজেকশন দেয়, আর সে তাতে আপত্তি পেশ করে বলে, ‘ওঃ, আব্বু! তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?’ তাহলে কী হবে? এটা তার ভালোর জন্য; কিন্তু সে তা জানে না। এ ইনজেকশন তার বডিতে পুশ করা হলে সে কষ্ট পাবে, এতটুকুই সে জানে, এর বেশি নয়। অথচ তার পিতা জানে, এ কষ্ট তারই ভালোর জন্য।

এভাবে পিতা তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে সন্তানকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেন বাড়ির বাইরে গিয়েছিলে? তুমি তার সাথে মিশ কেন? পিতা সন্তানকে প্রহারও করেন; এতে সে ব্যথা পায়। তিনি শ্রেফ তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে এসব করেন। তো বিশ-ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে যদি এমন পার্থক্য উপলব্ধ হয়, তাহলে সীমিত জ্ঞানী আর আল্লাহর মধ্যকার পার্থক্য কেমন হতে পারে?

নিঃসন্দেহে আপনি যদি এ ধরনের উপমা চিন্তা করেন, ভেবে দেখেন, মানুষের পরিচয় কী? তার জ্ঞান সীমিত, সে দরিদ্র, দুর্বল এবং আল্লাহর প্রতিপালিত বান্দা; তাহলে এসব কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারবেন। আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন আমার চোখ আলোয় ভরপুর করেন এবং এই প্রশ্নকারী-সহ আমাদের সকলের অন্তর আলোকিত করে দেন। তিনি যেন আমাদের থেকে ইমান বিধ্বংসী প্ররোচনা ও সংশয় দূরীভূত করেন।

এক্ষেত্রে শিথিল হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং ইবাদত, সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সাথে সাথে দোয়া কবুল সময়গুলোতে তাঁকে ডাকতে হবে—ফজরের পূর্বে শেষ রাতে, দুপুর রাতের পরে এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। কিংবা আজান-ইকামতের মাঝে দোয়া করবে। এ সময়ের দোয়া সুমিষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত, এবং তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ। তাই সে আল্লাহর নিকটে এই কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি কামনা করবে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইবে।

তথ্যসূত্র: www.mimham.net/tan-4044-42।

ভাষান্তর: আব্দুর রহমান মুধা

পরিমার্জনা: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুধা